মার্ডার @করোনা.টাইম

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদঃ পূর্ণশ্রী নাগ

Aditi

মার্ডার@করোনা.টাইম

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদঃ পূর্ণশ্রী নাগ

Aditi

মার্ডার@করোনা. টাইম

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদঃ পূর্ণশ্রী নাগ



স্মৃতি পাবলিশার্স

MURDER@CORONA.TIME
A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE
Published by SMRITI PUBLISHERS
Website: www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০
প্রথম ই-বুক প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদপটঃ অদিতি চক্রবর্তী
অলংকরণঃ অনিরুদ্ধ বসু

প্রকাশকঃ
স্মৃতি পাবলিশার্স
"ওয়েসিস" সি এফ - ৪১ সেক্টার ১
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০০৬৪

ISBN No:978-81-948003-1-6

উৎসর্গ

আমার ছেলে

পরিক্ষিৎ নাগকে

যাদের সহযোগিতা এ লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

অনিরুদ্ধ বসু

ভূমিকা

এ এক অভূতপূর্ব সময়। লকডাউন চলছে - খানিকটা সারাদিনব্যাপী কারফিউয়ের মতো। বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না... বাস, ট্রাম, ট্রেন, প্লেন কিছুই চলছে না, একমাত্র এসেনশিয়াল সার্ভিসেস ছাড়া। ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এক কণা ভাইরাস - করোনা - দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা বিশ্বে, তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে।

এমনই প্রেক্ষাপটে অনিরুদ্ধ বসুর মাথায় এল খুনের গল্প লেখার। তবে তার প্রতিবন্ধকতাও অসীম। বাংলা সাহিত্যে এমন গল্প সম্ভবত আগে লেখা হয়নি। কোনও চরিত্র বাড়ি থেকে বেরতে পারবে না। পুলিশি তদন্তেও প্রচুর বাধা। এর মধ্যে খুনের ছক কষা, আবার তার সুরাহা বার করা লেখকের তিক্ষ্ণ মেধার পরিচয় দেয়। গল্পটি এক বিশিষ্ট বয়স্কা চলচ্চিত্র তারকার মৃত্যু ঘিরে। সহজ সরল স্বচ্ছন্দ গল্প। কিন্তু তার মধ্যেও রোমাঞ্চ, বৈচিত্র ও তিন রিপুর সংযত বিন্যাসে এ গল্প ফেলে রাখা দায়। গল্প নিয়ে আর কিছু বলব না, পাঠক তার মূল্যায়ন করবেন।

গল্পটা আদতে ইংরেজিতে লেখা। অনুবাদের দায়িত্ব পড়ল এ অধমের ওপর। পাঠকের পড়ে যদি মনে হয় এটা বাংলা গল্প সেখানেই অনুবাদের সার্থকতা।

আশাকরি গল্পটা পাঠকের মনোগ্রাহী হবে।

পূর্ণশ্রী নাগ

কলকাতা নভেম্বর ২০২০

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...



পেশায় প্লাস্টিক সার্জেন, নেশায় লেখক অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ কলকাতায়। বি ই কলেজের স্নাতক ইঞ্জিনিয়ার বাবা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্র মোহন বসু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্য পদক প্রাপ্ত বাংলার স্নতাকোত্তর মা স্বর্গীয় ইলা বসুর-র উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ। পরে ইউনাইটেড কিংডমের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেনস থেকে এফ আর সি এস। ইংল্যান্ডে বহু বছর কাটিয়েছে। দু-বছর মধ্য প্রাচ্যেও। এখন কলকাতার প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেন। দেশে ও বিদেশে অন্যতমদের মধ্যে একজন।

ছোটবেলা থেকেই লেখায় আসক্তি। স্কুল পত্রিকা **'নিহিল উল্ট্রার'** সম্পাদক পদের দায়িত্বে থাকাকালীন নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। পরে ইংল্যান্ড ও কুয়েতে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ।

নিয়তি কেন বাধ্যতে। অনেক সময় নিয়তি বিভিন্ন আঙ্গিকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ব্যস্ততার মধ্যে ২০০৬ শালে পায়ের হাড় ভেঙে ছ'মাস হুইলচেয়ারে থাকাকালীন সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় পুনরায় লেখালেখি শুরু। সেই সময় **'অন্বেষণ'** উপন্যাস রচনা। যা প্রকাশিত হয় ২৫ আগস্ট ২০০৭-এ। নতুন আঙ্গিকের এই উপন্যাস সাড়া ফেলে দেয় সংস্কৃতি মহলে। বেস্টসেলার শুধুই হয়নি, ব্যস্ত প্র্যাকটিসের মধ্যেও লেখায় অনুপ্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয় উপন্যাস **'নিঃশব্দে'**ও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। শুধু তাই নয়, লন্ডন বুক ফেয়ার ও জাতীয় মাধ্যমে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ভবিতব্য নতুন সৃষ্টির দিক খুলে দিগন্তে নতুন দিশার আলো দেখায়। বহু দেশ থেকে সংগৃহীত মানুষ, সমাজ, উপলব্ধি বন্দি হয় তার লেখনীর বিভিন্ন আঙ্গিকে। ব্যস্ততার মধ্যেও সময় খুঁজে নেয় নতুন চেতনার রচনাশৈলীতে। খুনের গল্পের বিবর্তন থেকে বৈজ্ঞানিক দর্শন তার লেখাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

এই উপন্যাসটি **মার্ডার@করোনা.টাইম** ভিন্ন স্বাদের। বারবার নিজেকে ভাঙার মধ্যেই তার নতুনত্বের প্রকাশ। প্র্যাকটিসের বাইরে সেখানেই তার শান্তি। তার প্রতিটা উপন্যাস মৌলিক চিন্তাধারার ফসল। অনেক ক্ষেত্রে সাবেকিয়ানা ভেঙে বেরবার প্রয়াস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যকে নতুন করে খুঁজে চিনতে। তাকে লেখনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

লেখা তুমি আত্মদহনে জ্বলো

যদি নতুন সুরে, নতুন তানে না কিছু বলতে পার।

রবীন্দ্রসংগীত, ক্লাসিক্যাল সংগীতের অনুরাগী অনিরুদ্ধ বসুর শান্তির নীড় স্ত্রী স্মৃতি বসু।

লেখকের অন্যান্য বাংলা উপন্যাস



লেখকের অন্যান্য ইংরেজি উপন্যাস



রাগ বৃন্দাবনী সারেঙ্গের মনমোহিনী সুর তখন চারপাশে ছেয়ে। নগ্ন অস্মিতা শাওয়ার থেকে শিথিল পায়ে বেডরুমের দিকে। করোনা প্যানডেমিকের দৌলতে লকডাউনে চিত্তরঞ্জন পার্কের বাড়িতে গৃহবন্দি। তাই কোনও তাড়া নেই। ভাগ্যিস বিগ বাস্কেটের স্লটটা পেয়েছিল, তাই দিন দু-তিনের জন্য নিশ্চিন্ত। সসেজ দিয়ে চিজ পাস্তা করা কমপ্লিট। শুধু খাওয়ার আগে গরম করে নিলেই হবে। তারপর রোজকার মতো দুপুরের ঘুম। বিকেলে অনলাইনে অফিসের কাজ।

তপ্ত প্রখর দিল্লির আবাহে পাখিদের কলতান মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতি কীভাবে সেকল পরিয়েছে মনুষ্যরূপী ভ্রষ্ট আত্মাদের। এখন স্বস্তির নিঃশাস ফেলছে এই দূষণমুক্ত পরিবেশে। অন্যান্য সব সৃষ্টি এখন তারই ঐকতানে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তির সঙ্গত বিশ্বের চরাচরে। বিলীন হওয়া বসন্তের মৃত সবুজ গাছগুলো দিল্লির শুষ্ক তপ্ত গরমে ইঙ্গিত দিচ্ছে এক দীর্ঘমেয়াদি পৃথকীকরণের। ঘরে, নিজের একান্তই স্বস্তির কোণে, ঝলসানো সূর্যের আড়ালে... এক কন্ঠরোধ করা মনকেমন করা একাত্মতা।

পৃথিবী কি আবার আগের মতো হবে? এই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার পর? যেন জীর্ণ আত্মার আবার নতুন করে নতুন রূপে স্বচ্ছল সমৃদ্ধিতে প্রস্ফুটিত হওয়ার ইঙ্গিত। অস্মিতার কোনও ইচ্ছেই নেই অনিবার্যকে নিয়ে জল্পনার। লকডাউনের কয়েক সপ্তাহ ধরেই মিডিয়াতে এই ভাইরাসের মারণ তথ্যে সে জর্জরিত। শখ নেই তা নিয়ে অযথা সময় নষ্টের।

বরং নিজেকে আরও সুন্দর করে সাজানো ভালো। বেডরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তিত। এই লকডাউনের তিন সপ্তাহে ওজন বেড়ে গেল, নাকি এতদিন তো রেগুলার জগিং করে শরীরের খাঁজগুলো ঠিক রেখেছিল। তার ৫'২'' আঁটসাঁট চেহারটায় অনুকূল পরিমাণ মেদে শরীরটা আরও হৃষ্টপুষ্ট। শ্যামলা রংটায় এখন আর তেলচিটে ভাব নেই। বরং ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে বেরচ্ছে। ড্রাইভ করে অফিসে যতায়াত, ঠান্ডা এসির পরিবেশে কাজ। বাইরে বেরোতে হয় না। খুব ভালোই জানে, রূপলাবণ্যে ভরা শরীরটা এখনও কত পুরুষকে লুব্ধ করে। কালো কুচকুচে চুল, নিখুঁত দাঁতের সেটিং, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অস্মিতা আবার নিজেকে দেখল। নিখুঁত শরীরটায় হাত বোলাল। কালো ভেজা চুলের কিছু অংশ ছড়িয়ে পড়েছে আঁটসাঁট বুকে। স্তন থেকে ক্রমশ দেহটা সরু কোমরে। বাড়িয়ে দিয়েছে বুকের উচ্চতাকে। নাভির গভীরতায় কোনও বন্ধন নেই। সেই ঢেউ আবার পূর্ণতা লাভ করেছে পুরুষ্ট নিতম্বে। এবার পেছন ফিরে, ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখল। দুই নিতম্বের সঙ্গমের খাঁজটা আরও স্পষ্ট হয়ে মিশে গেছে এক অতল গভীর খাঁজে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে যৌবন যেন বেশি করে ঠিকরে বেরচ্ছে। চল্লিশোর্ধ শরীরটা দেখতে এখন বেশ লাগে। অবাঞ্ছিত মেদের সমাবেশ হয়নি দেখে সোয়াস্তি।

যাক্। এতেই সন্তুষ্টি যে এই অনির্দিষ্ট কোয়ারান্টিনে তাকে রোজের যোগা আর ডায়েট নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ভেজা চুল ফ্যানের হাওয়ায় মেলে শরীরটা এলিয়ে দিল বিছানায়। আফসোস্ একটাই। কোনও আর্টিস্ট নেই এই মানবীর শরীরের রেখাকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলার মতো।

তাহলে এ যুগে রেনোইয়ার আরেক ‘স্লিপিং বেদার’ তার তুলিতে ক্যানভাসে ফুটে উঠত। অস্মিতার কোনও তাড়া নেই লাঞ্চ খাওয়ার। খাওয়ার পরই তো ঘুম। এটাই এখনকার রুটিন। অথচ এই কদিন আগেও ছুটির দিনে, কলকাতার হাইল্যান্ড পার্কের ফ্ল্যাটে, ঘর গেরস্থালীর কাজে ব্যস্ত থাকতে হত।

সৌরিককে খুব মিস করছে। তাই হস্তমৈথুনে সাময়িক মুক্তি। ঘুম ভাঙার পর, অনলাইনে ‘ওয়ার্ক ফ্রম হোম’ শুরু করার আগে হোয়াটস অ্যাপে মেসেজগুলো চেক করতে বসল। প্রচুর মেসেজ জমা পড়েছে। স্বাভাবিক। এখন তো সবাই ছুটির মুডে। যত গপ্পো, কোভিড ১৯ তথ্য, কিছু জোকস ক্লান্তি দূরে রাখে।

হঠাৎ একটা অপরচিত নম্বর থেকে মেসেজ দেখে অবাক। একটা ছবি... তার ধর্ম-মা ঐশিকা গুলিবিদ্ধ মাটিতে শুয়ে। সঙ্গে একটা লাইন.. *‘ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি’*। একি! কী হয়েছে মায়ের! সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কে এই লোক যে তাকে এমন ছবি পাঠাল? কোনও ফটোশপ ট্রিক না তো! বিশ্বাসই করা যায় না। গতকালই তো কথা হল। দিব্যি ভালো ছিল তো মা।

“রোজগার বন্ধ। জমানো টাকায় সব খরচ” ঐশিকা বিরক্ত।

“এমনই অবস্থা বেশিরভাগ লোকেদের যারা দৈনিক রোজগার করে” অস্মিতা বোঝানোর চেষ্টা করে।

“আমি ক’দিন চালিয়ে নিতে পারব, কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এত লোক যারা দিন-আনে দিন-খায়? তাদের কী হবে?”

ঐশিকা রায়, বাংলা চলচ্চিত্র জগতে গত চল্লিশ বছর ধরে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। এখনও তার দাপট কিছু কম নয়। এখন অবশ্য ক্যারেকটর রোলে। শুরু সেই বিশ বছর বয়েস থেকে। এখন ষাটের ঘরে। যথেষ্ট টাকা জমিয়েছে এই চল্লিশটা বছরে। কাজ না করলেও সারাজীবন দিব্যি হেসে-খেলে চলে যাবে। আপত্তি এই কাজ না থাকায় ঘরে বসে থাকা। তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না। অস্মিতা ছাড়া, এ কথাটা আর কে জানে এত ভালো করে? বিয়ে করেনি। তাই গোটা জীবনটাই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। অস্মিতা শুধু বাৎসল্য রসে সমৃদ্ধ করেছে তার একাকী জীবনে। তাও ইদানিং শুধুই ফোনে, দিল্লি থেকে।

অস্মিতা তৎক্ষণাৎ ফোন করল ঐশিকাকে। বেজে গেল। কেউ ধরল না। তাহলে কী সত্যি! হাত-পা ছড়িয়ে ধপাস করে বসে পড়ল মেঝেতে। নিতান্তই অসহায় বোধ করছে। না পারছে এই খবরের সত্যতা যাচাই করতে, আর না পারছে মায়ের কাছে চলে যেতে। এই লকডাউনে তো ফ্লইট বন্ধ। কী করবে? চিন্তা বাড়তে শুরু করেছে। কাকে জিজ্ঞেস করবে?

সৌরিক তো কলকাতায়। অস্মিতা সৌরিককে ফোন করল “এই মাত্র একটা মেসেজ পেলাম হোয়াটসঅ্যাপে। মাকে খুন করা হয়েছে। সঙ্গে তার ছবি। জানি না ঠিক কিনা। খোজ নিতে পারবে?”

***

সৌরিক সবে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চা নিয়ে করোনা ভাইরাসের আপডেট দেখছিল। হু-আমেরিকা-চিনের দোষারোপের খেলা। সঙ্গে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা স্ক্রিনে বারে বারে ফ্ল্যাশ। সবই ব্রেকিং নিউজ। মিডিয়ার ওপর বিরক্তি এসে গেছে সৌরিকের। একে অপরকে টেক্কা দিতেই ব্যস্ত! এতে তো জনসাধারণের মধ্যে ভয় সঞ্চারিত হবে। ঘরবন্দি মানুষের মনে একটা নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট। নিজের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখতে টেলেভিশনটা বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

এই পূর্ব মহানগর কেমন যেন অচেনা তার হাইল্যান্ড পার্কের চোদ্দ তলার বারান্দা থেকে। দু-একটা গাড়ি ছাড়া আর কিছুই চলছে না। তাই দূষণ নেই বললেই চলে। মনেই পড়ে না এত পরিষ্কার আবহাওয়া কোনও দিন দেখেছে কিনা। বাইরে কোকিলের কুহু মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে মিশে ভীমপলশ্রীর নবীনতার মূর্ছনা। এককালে ভারতীয় ক্ল্যাসিকল সঙ্গীতের খুব ন্যাওটা ছিল। এখন কাজের চাপে সময় কোথায় এই সুললিত সুরের মাঝে শান্ত নির্জনতায় নিশ্চিন্তে ডুব দেওয়ার?

অস্মিতার অবর্তমানে সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে সৌরিকের আবার ওই নেশায় ডুবতে ইচ্ছে হয়েছিল। লকডাউনে বাড়িতে কাজের মাসি আসতে পারছে না। ফলে কাজের চাপ অনেক বেশি। তার ওপর তাদের দশ বছরের মেয়ে রুচিরার দেখাশোনা করতে হচ্ছে। এত কাজ করতে বিরক্ত লাগছে। অস্মিতাকে দু'মাসের ট্রেনিংয়ের জন্য দিল্লি পাঠিয়েছে কোম্পানি থেকে। তখন বাড়ির বেশিরভাগ কাজই মাসিরা করে দিত। তাই অস্মিতার অনুপস্থিতিতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না। যদি না লকডাউন হত এর মধ্যে ফিরেও আসত। সৌরিক রান্নায় তেমন পটু নয়। তবু এখন রোজ কিছু না কিছু বানাতে হয়। কারণ হোম ডেলিভেরির ওপর বিশেষ ভরসা করা যায় না। বেটার সেফ দ্যান সরি।

সৌরিক একটা ওয়েব সিরিজ দেখবে ঠিক করে সবে লাউঞ্জে ফিরছে তখনই মোবাইলটা বেজে উঠল।

"মা'র খুন হয়ে গেছে সৌরিক!" অস্মিতার কান্নাভেজা আর্তনাদ।

"কী...ই... ই...?"

"এই মাত্র হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এসেছে... একটা ছবি... মাকে কেউ শুট করেছে। জানি না সত্যি কি না। কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখবে?"

এ তো পুরো বজ্রাঘাত! সময় লাগল ধাতস্থ হতে।

"তুমি বুঝতে পারছ কী বলছ!" সৌরিকের সন্দেহ হল এই একাকীত্বে অস্মিতার মানসিক অবস্থা নিয়ে।

"তোমার কি মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে গেছি?" এক ধমক অস্মিতার।

চিত্‌কারে সৌরিকের সম্বিত ফিরল।

‘‘মেসেজটা আমাকে এখনই ফরওয়ার্ড কর’’

‘‘হ্যা, এই নাও... পাঠিয়ে দিলাম’’

সৌরিক ছবিটা খুলতেই দেখল, এই তো ঐশিকা কার্পেটের ওপর শুয়ে। সদ্য লাগা গুলির ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে কার্পেটের ওপর। ছবিতে আর কোনও ক্ষত দেখা যাচ্ছে না। ওর পায়ের কাছে বসার ঘরের ক্যাবিনেটের অংশটাই প্রমাণ দিচ্ছে যে, এটা ওর সল্ট লেকের ইই ব্লকের বাড়ি। ছবির সঙ্গে একটা ছোট্ট মেসেজ *‘ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি’*

ওই বাড়ির ফার্নিচার সৌরিকের অনেক দিনের পরিচিত। অস্মিতা আর রুচিরার সঙ্গে কত বার যে গেছে ঠিক নেই। অস্মিতার ধর্ম-মা এই ষাটোর্ধ্ব অভিনেত্রী এখনকার যে কোনও নায়িকাকে টেক্কা দিতে পারে। না জানি যৌবনে কত সুন্দরী ছিল। তা না হলে এখন এই বয়েসেও এত কাজ হাতে, সদা ব্যস্ত? বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠল সৌরিকের হাইল্যান্ড পার্কের বাড়িতে!

‘‘এ তো জেনুইন মনে হচ্ছে’’

‘‘এই দিল্লিতে আটকে রয়েছি, ফ্লাইট চলছে না.. কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না’’ দিশেহারা অবস্থা অস্মিতার।

‘‘দাঁড়াও চিন্তা করো না। আমি দেখছি কী করা যায়। চেক করে দেখি এটা ঠিক খবর কি না। আমি তো বাড়ির বাইরে যেতে পারব না’’ সৌরিক একটু থামল ‘‘জানো, লালবাজারের আউট সোর্সিং জবটা করার সময় বিধাননগরের এসপি অগ্নিদেব চ্যাটার্জির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওনাকে একবার রিকোয়েস্ট করতে পারি খোঁজ নেওয়ার জন্য’’

‘‘কতক্ষণ লাগবে মনে হয়?’’ অস্মিতা অধৈর্য।

‘‘এখন ছাড়ছি। আগে কথা বলতে দাও। তারপর তোমাকে জানাচ্ছি’’

‘‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...’’

‘‘একদম’’ সৌরিক লাইনটা ছেড়ে দিল।

বাংলায় এখন পলিটিক্যাল বা আন্ত-আন্ডারওয়ার্ল্ড মার্ডার কোনও ব্যাপারই না। কিন্তু কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া খুন, বড় উদ্ভট। ঐশিকা কি কোনও পলিটিক্যাল দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল? সৌরিকের জানা নেই। ওঁর তো আর এখনকার নতুন হিরোইনদের মতো শেষ বয়েসের পেনশনের জন্য পলিটিক্যাল দলে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। হাসিখুশি এই মহিলা নিজের চেহারা ঠিক রেখে নিজের কর্মদক্ষতায় এখনও মেন রোলগুলোয়। যা তার সমসময়িক অনেকেই করতে অক্ষম।

উদ্দেশ্য তো অনেক হতে পারে। সবটা না জেনে আন্দাজ করা মুস্কিল। জামাই হিসেবে কোনও দিনই তার সমন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেনি সৌরিক। এখন যদি সত্যিই না থাকে তাহলে ওঁর সমস্ত যোগাযোগের ব্যাপারে অস্মিতার কথাই শেষ। পুলিশ বাধ্য না করলে কেউই অমন নাম করা

অভিনেত্রীর ব্যাপারে মুখ খুলবে না। অগ্নিদেব একদম ঠিক অফিসার যে এই সূক্ষ্ম তদন্ত যথার্থ ভাবে করতে পারবে। সৌরিক লালবাজার থেকে ওর মোবাইল নম্বর জোগাড় করল।

অগ্নিদেবকে ফোন ‘‘সৌরিক বলছি। ইউনিটেক ইউনিভার্সাল থেকে। চিনতে পারছেন?’’

‘‘নিশ্চয়ই, চিনতে পারব না কেন? তুমিই তো লালবাজারের কম্পিউটার আউটসোর্সিংয়ের কাজ কর। তাই না?’’

‘‘একদম ঠিক। একটা অনুরোধ ছিল।’’

‘‘বলে ফেল... এই লকডাউনে যদি কিছু করতে পারি’’

‘‘আমার স্ত্রী দিল্লিতে। একটা অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ এসেছে যে, আমার শাশুড়িকে গুলি করে মারা হয়েছে তাঁর সল্ট লেকের ইই ব্লকের বাড়িতে। আমরা এর সত্যতা বুঝতে পারছি না। এই লকডাউনে বেরতেও পারব না। আপনি কি একটু কনফার্ম করতে পারবেন?’’

‘‘কেউ হয়ত মশকরা করছে। ঠিক আছে, আমি ওদিকেই যাচ্ছি, চেক করে তোমায় জানাচ্ছি। এটা কি তোমার নাম্বার?’’

‘‘হ্যাঁ ’’

‘‘আচ্ছা, সেভ করে রাখি’’

***

অগ্নিদেব সবে ফিরেছে কাজ থেকে। লকডাউনে মানুষকে ঘরে রাখাই এখন মুখ্য কাজ। রোজকার দুর্বৃত্ত ধরা, চুরির তদন্ত করা, অবৈধ কাজকর্মের ওপর রেড, অ্যাকসিডেন্টের ঝামেলা সামলানোর থেকে এখন কাজটা একটু অন্য রকমের। এখন বিধান নগরের বাসিন্দাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখাটাই আসল কাজ। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষের, যাঁরা একা থাকেন, ছেলে-মেয়েরা বিদেশে। তাঁদের কোনও অসুবিধা হলে সাহায্য করা, জরুরি বাজার বা ওষুধের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সর্বোপরি অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘনকারীদের নিবৃত্ত করা।

মোটামুটি স্বেচ্ছাসেবীর কাজের মতো। মন্দ লাগছে না অগ্নিদেবের। ষাটের কাছে, দু-দিন বাদেই রিটায়ারমেন্ট। বুঝতে অসুবিধা হয় না বয়স কালের বিপর্যয়। অনেক সাহায্য পেয়েছে সারা জীবন কর্মক্ষেত্রে। চা নিয়ে বসার আগে জামাকাপড় পাল্টে, স্নান। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলে রিটায়ারমেন্টের আগে এমন একটা ফ্ল্যাগশিপ পোস্টিং আর ডিপার্টমেন্টাল প্রোমোশনের দৌলতে আইপিএস গ্রেডে উন্নতি।

স্নান শেষে সবে আরদালির তৈরি নেসকাফে নিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে আরাম করে বসে চুমুক দিতে যাবে, তখনই ঐ অলুক্ষুনে ফোনটা বেজে উঠল।

সৌরিকের যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সেভ করে জিজ্ঞেস করল ‘‘ওনার নাম কী?’’

‘‘ঐশিকা রায়, বিখ্যাত চলচ্চিত্র নায়িকা’’

‘‘ওনার পুরো কন্টাক্ট ডিটেলস টেক্সট কর। দেখছি’’

যাচ্ছেতাই! একটু বিশ্রামের সময়ও পাওয়া যাবে না! এখন কফি খেয়েই ছুটতে হবে ।

মনে পড়ল সৌরিক এক অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী সুবর্ণ চ্যাটার্জির একমাত্র ছেলে। ক’বছর আগে ওর বাবা-মা দু-জনেই একসঙ্গে গলসিতে এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান, শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে। রেখে যান তাঁদের একমাত্র পুত্র সৌরিককে। তাঁদের বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। প্রথম এই বিচক্ষণ, বিদ্বান কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটির সঙ্গে আলাপ যখন ইউনিটেক ইউনিভার্সালকে নিযুক্ত করা হয় বিধাননগর পুলিশ স্টেশনের সফটওয়ারের কাজ করার জন্য।

‘‘আপনার অফিস কোথায়?’’

‘‘থিয়েটার রোডে প্রেমলতা বিল্ডিং। ছোট অফিস, কিন্তু সবাই দক্ষ কর্মী। যেহেতু আমরা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করি তাই আমাদের কর্মীই মুখ্য। অফিসের পরিসর নয়।’’

অগ্নিদেব শুনেছিল এই কোম্পানি সফটওয়ারের কাজ করে। লালবাজার ছাড়াও বহু বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে এদের টাই-আপ আছে। কাজের মাধ্যমে এই ছেলেটির সঙ্গে বেশ আলাপও। আন্তরিক, দক্ষ, ছেলেটির কৌতুক রসও কম না। তাই ওর শাশুড়ির কথা শুনে না করতে পারল না। এই লকডাউনে খুন কী আর হবে। নির্ঘাত কোনও বেকার ছেলের তামাশা।

রোজকার কাজের মাঝে এসব খুনের ঘটনা বাড়তি মাথা খারাপ করে। পুলিশ ইনচার্জ হিসেবে দায় ওর, তাই ওকেই এই ঝামেলা মেটাতে হবে। যেহেতু বিধাননগরে অবস্থাপন্ন মানুষের বাস, সেহেতু খুনখারাবি এখানে বিশেষ হয়ই না, যদি না ডাকাতি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে। পলিটিক্যাল গন্ডগোল থাকা সত্ত্বেও খুন বিশেষ একটা হয় না। এটাও তার ভাগ্য। ফলে হাতে সময় থাকে শখের নভেল লেখার জন্য। গত দু’বছর ধরে ওটা নিয়ে পড়ে। ইচ্ছে পরের বছর রিটায়ারমেন্টের আগে শেষ করার। যে গতিতে চলছিল তাতে ভাটা পড়েছে এই আচমকা প্যানডেমিকের জন্য।

যদি খবরটা সত্যি হয়, তাহলে এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা অত্যন্ত অবাঞ্ছিত। শুধু একজন কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসারই না, লালবাজারের এক নিকট পরিজনের অনুরোধ রাখতেও সে বাধ্য। চা শেষ করে আবার পুলিশের পোশাকটা পরে নিল ইই ব্লকের উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য।

ইই ব্লক প্রধানত জি+৪ কো-অপারেটিভ কনডিমিনিয়ামসের ক্লাস্টার। গাড়ি ছুটছে তীব্র বেগে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে। একটা চিন্তা নাড়া দিল। ঐশিকার মতো এত নামী অভিনেত্রী টলিপাড়ার কাছে গল্ফ গ্রিনে না থেকে এত দূরে সল্ট লেকে কেন? রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় ব্লকেডস দাঁড় করানো হয়েছে তারই নির্দেশে। যাতে লোকেরা যাতায়াতের সঙ্গে ভাইরাসটা সহজে ছড়াতে না পারে।

সকল পরিচিত ছাঁচ ভেঙে দিচ্ছে এই গ্লোবাল প্যানডেমিক। কেউ বলতে পারছে না কবে এর অ্যান্টিডোট বেরবে বা কবে এই রোগকে কাবু করতে পারবে। তাই এই স্থিতাবস্থা অনিশ্চিত। যত

তাড়াতাড়ি এই ভাইরাসকে কাবু করা যায় ততই মঙ্গল। এটি একটি বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়। ওই ১৯১৮-র জানুয়ারি থেকে ১৯২০-র ডিসেম্বরের স্প্যানিশ ফ্লু-এর পর। এই বিপর্যয় যদি দু'বছর থাকে তাহলে অসংখ্য মৃত্যুর সঙ্গে বিশ্বের অর্থনীতিও সংকটে পড়বে। এর থেকে বেরিয়ে আসতে বহু যুগ লেগে যাবে। যেটা আরও বেশি নাড়া দেয় তা হল, এই প্যানডেমিকের মাধ্যমে প্রকৃতি বুঝিয়ে দিল, মানুষের অবাধে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করার কুফল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই করতে নেই। প্রকৃতি নিজেই নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারবে, গতিশীল সুস্থিতি বজায় রাখবে। পৃথিবীতে সম্পদ সীমিত। চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে। এমন তো চলতে পারে না। তাই হয় সম্পদ বাড়াতে হবে, না হয় চাহিদা কমাতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ এখন তলানিতে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই প্যানডেমিকে কী করতে পারে নিজের অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে।

কলিং বেল বাজাল। কোনও উত্তর নেই। ফ্ল্যাটের দরজা লকড্। খবরটা ঠিক, না ভুল জানা নেই। তাই একটু ইতস্তত করে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পরও যখন কোনও উত্তর এল না, অগ্নিদেব সৌরিককে ফোন করল ''দরজা ভেতর থেকে লকড্। ঠিক খবর তো?''

''অস্মিতা আমাকে এই মেসেজই পাঠিয়েছে''

''অ্যাড্রেসটা ঠিক পাঠিয়েছ? একবার চেক করে বল''

সৌরিক চেক করে বলল ''হ্যাঁ, ঠিক আছে। ছবির সঙ্গে মেসেজটা পাঠাচ্ছি, যেটা ওই অপরিচিত নম্বর থেকে এসেছে। এর মধ্যে অস্মিতার সঙ্গে আরেকবার কথা বলে কনফার্ম করছি। দু-মিনিটে কল ব্যাক করছি'' ফোনটা কেটে দিল সৌরিক।

কয়েক মিনিট বাদে অগ্নিদেবকে ফোন ''না ঠিক আছে। অস্মিতার দেওয়া অ্যাড্রেসটা আরেকবার পাঠাচ্ছি''

অগ্নিদেব চেক করে নিল। নাঃ, কোনও ভুল হয়নি ''সেক্ষেত্রে আমরা দরজা ভেঙে ঢুকছি। একটু সময় লাগতে পারে চাবিওয়ালার চাবি তৈরি করতে। এই কো-অপারেটিভের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি''

''যা দরকার করুন। শুধু সত্যিটা জানতে চাই'' সৌরিক অসহায়।

***

একঘণ্টা বাদে অগ্নিদেব ফোন করল, ''শেষ! আমি লাশের সামনে দাড়িয়ে আছি। ছবি পাঠাচ্ছি'' হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠিয়ে দিল সৌরিককে।

ফোন ছেড়ে অগ্নিদেব তদন্তের কাজ শুরু করতে উদ্যোগী হল। এই করোনার সময় খুন! অবিশ্বাস্য! এ-এক বাড়তি কাজ। এ সময়ে যখন অন্য দিকে নজর দেওয়া বেশি দরকার। আবার সুবিধাও হয়েছে, কারণ এখন লকডাউন চলছে। ঐশিকা রায় চলচ্চিত্র জগতের নজরকাড়া নাম। তার

মৃত্যুর খবর দাবানলের মতো ফলাও হতে পারে মিডিয়া জগতে। তবে করোনার খবর ছাপিয়ে যাবে কিনা, জল্পনার বিষয়। চেষ্টা করবে যাতে মিডিয়া আঁচ না পায়।

অফিস থেকে স্টাফ আর ফরেনসিক টিমকে ডেকে পাঠাল। প্রিলিমিনারি তদন্ত শেষ করে ফিরতে হবে এখনকার কাজে। এখন ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। ভাইরাস ছড়ানোর ভয় আছে। তদন্ত কীভাবে এগোবে সেটা নিয়ে চিন্তা করা যাবে।

মাটিতে কার্পেটের ওপর লাশটা পড়ে অলসভাবে বুকে একটা মাত্র ক্ষত নিয়ে। রক্তের ধারা শুকিয়ে কালচে, গড়িয়ে পড়েছে কাফতান থেকে কার্পেটে। হয়তো ওর কয়েকটা ছবি দেখেছে। কিন্তু এখন মেকআপ ছাড়া খুবই সাদামাটা।

টিম এসে পড়তে লাশ ময়না তদন্তে পাঠানোর নির্দেশ দিল।

লাউঞ্জের টেবিলের ওপর পড়ে থাকা মোবাইলটা নিয়ে শোবার ঘরের দিকে এগোল। ঘরে চোখ বোলাতে নজরে পড়ল খাটে রাখা ল্যাপটপটা। ওটা তুলে নিল। ভবিষ্যতে দরকার হবে তদন্তের কাজে। আজকালকার ইন্টারনেটের দিনে মোবাইল আর ল্যাপটপ সব থেকে দরকারি ক্লু দিয়ে থাকে। আবার লাউঞ্জে ফিরে লকটা চেক করল। নাঃ, একদম অটুট। এটা তো সেল্ফ লকিং সিস্টেম। কোনও হাতাহাতি নেই। তার মানে, যে এসেছিল সে ঐশিকার পরিচিত। আরেকটা হতে পারে, ঐশিকা নিজেই নিজেকে গুলি করেছে। তা হলে পিস্তলটা কোথায়? খুঁজে পাওয়া গেল না। এও হতে পারে অন্য কারও কাছে ফ্ল্যাটের চাবি আছে যা দিয়ে ঢুকেছে। পিস্তলের অবর্তমানে সুইসাইডের সম্ভাবনা নেই। অন্য দুটো সম্ভবনা। মুশকিল হল, এখন লকডাউনের মাঝে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। খুনের উদ্দেশ্যটাই আসল। আঁচ না করা গেলে জিজ্ঞাসাবাদে বিশেষ লাভ হবে না। নিশ্চয়ই ল্যাপটপ আর মোবাইল থেকে কোনও লিড পাওয়া যাবে।

ফরেনসিক টিম ব্যস্তভাবে নিজেদের রুটিন কাজ সামলাচ্ছে দেখে সৌরিককে ফোন করল "ওনার মেয়েকে খবর দিয়েছ?"

"হ্যাঁ। একা ওখানে। খুব কান্নাকাটি করছে। দিশেহারা অবস্থা। সব যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ, জানি না এসে পৌঁছতে পারবে কি না।

"এখানে কোনও আত্মীয়স্বজন আছে?"

"না, আমি ছাড়া আর কেউ নেই। অস্মিতা এখন শোকগ্রস্ত। ওকে একটু সময় দেব সামলে নেওয়ার জন্য। আপনি তদন্ত চালিয়ে যেতে পারেন" সৌরিকের সময় দরকার অস্মিতাকে শান্ত করতে। এখানে রুচিরাকেও সান্ত্বনা দিতে হবে, দিদিমার বড় আহ্লাদি ছিল।

"আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর লাশ ময়না তদন্তে যাবে। ততক্ষণে তোমরা সামলে নাও।"

বড় খাটনি গেছে আজ। এই মৃত্যু কাজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সব গুটিয়ে বাড়ি গিয়ে একটা সিঙ্গল মল্ট নিয়ে আরামে জিরোনোর ইচ্ছেটা প্রবল। কমপ্লেক্সের সেক্রেটারি এবং আরও কিছু লোক বাইরে অপেক্ষায়। সেক্রেটারি-ই নিশ্চয় এদের বলেছে যখন দরজা খোলার কথা হচ্ছিল। এখন সকলেই উন্মুখ পুলিশের প্রাথমিক ভাবনা জানতে।

"খুন তো বটেই, কোনও পরিচিতর কাজ। ওনার মেয়েকে খবর দেওয়া হয়েছে। সে এখন দিল্লিতে। জামাই কলকাতায়। কথা হয়েছে। বডি এখন ময়ন তদন্তে পাঠানো হচ্ছে।"

"আমাদের থেকে কোনও সাহায্য লাগবে?" একজন প্রশ্ন করল।

"নিশ্চয়ই। তবে এক্ষুনি না। পুরকায়স্থ বাবু আপনি আমায় এই কমপ্লেক্সের সকলের নাম আর ফোন নম্বর হোয়াটসয়াপ করে দেবেন? এখন তো আর বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। তাই হোয়াটসঅ্যাপেই যোগাযোগ করতে হবে"

সেক্রেটারি সমর পুরকায়স্থ সায় দিলেন "নিশ্চয়ই, আর কিছু?"

"আজ বাইরের কেউ এসেছিল এখানে?"

"আমরা তো বাইরের কোনও কাজের লোককেকেই ঢুকতে দিচ্ছি না। অনলাইন ডেলিভারির লোকেরা গেটে প্যাকেট রেখে যায়। বাইরের লোক ঢোকার অবকাশই নেই।"

"সিকিউরিটির সঙ্গে চেক করে বলবেন কেউ ঢুকেছিল কি না"

সমর মাথা নাড়ল "হ্যাঁ, ডিসিনফেকশনের লোকেরা এসেছিল।"

"ওদের তো দরকার। আসবেই তো"

এই লকডাউনে এই নতুন পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করার উপায়। দারুণ ব্যাপারটা। নেট বেসড! নজরদারিটাও উন্নত দেশের মতো হলে আরও বেশি লাভদায়ক হত। বুঝতে পারল না ঐশিকা কতখানি নেট ঘাঁটত। ওর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে ।

সে সব পরে দেখা যাবে। ময়নাতদন্তের পর লাশের সৎকার করতে হবে। তাকে সৌরিকের ফোনের অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ সিঙ্গল মল্ট।

ড্রাইভ করে বাড়ি ফেরার পথে দূষণহীন সায়াহ্নের আকাশে অপূর্ব রঙের ছটা! গাড়ি নেই, স্বচ্ছ গোধূলি শিথিল মন্থর হামাগুড়ি দিয়ে রাতের ওড়নায় ঢেকে দিয়েছে। অধরা রাত ধরা দিচ্ছে মধু মহিমায়, আঁধারে সন্ধ্যাতারার জোনাকি জ্বালিয়েছে তার প্রকাশ মাধুর্যে।

ড্রিংক নিয়ে অপেক্ষা শুধু সৌরিকের ফোনের।

***

অস্মিতার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একা এত দূরে দিল্লিতে আটকে। কলকাতা যেতে পারবে বলে তো মনে হয় না। হঠাৎ করে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। তার শৈশব, যৌবনে আন্তরিকতা,

গতকালের ফোনে কথা... সব ছবির মতো চোখে ভাসছে। আকস্মিক মা চলে গেল তাকে অনন্ত শোকের মধ্যে ফেলে।

অন্য দিকে সৌরিকের প্রতীক্ষা অস্মিতার এই আচমকা মাতৃবিয়োগে ধাতস্থ হতে। পাঁচ মিনিট কাটতেই ফোন ‘‘মা কোথায়?’’

‘‘ওরা ওনার বডি পোস্ট মর্টেমে পাঠিয়েছে। হয়ে গেলে সৎকারের ব্যবস্থা। আর কেউ আছে যাদের সৎকারের সময় ডাকতে হবে?’’

‘‘মায়ের জীবনে শুধুই কাজ। কাজের মধ্যেই সব সময় থাকতেন। কয়েকজন আছে। যদিও তাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তারা মায়ের সেলিব্রিটি স্ট্যাটাসকে হিংসে করত’’ এক মিনিট থামল অস্মিতা। ‘‘ও হ্যাঁ, একজন আছে, দীপঙ্কর সেন। মায়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি অঙ্কল বলি। জানি না ছোটবেলায় ওদের মধ্যে প্রেম ছিল কি না, যদিও দু-জনে ভীষণ ভালো বন্ধু। আমি ওনাকে খবর দেব’’

‘‘আর কেউ আছে যাকে খবর দিতে হবে সৎকারে?’’

‘‘খবর দিলেও তারা আসবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। চূড়াটা বড়ই নিঃসঙ্গ’’

‘‘তা হলে?’’

‘‘সৎকারের সময় সব নিয়ম ঠিক মতো মানবে। এখানে শিব মন্দিরে শ্রাদ্ধের কাজ হয়। কিন্তু এখন তো বন্ধ। এখন আমার একটাই উপায়, একজন পুরুতমশাইকে বাড়িতেই ডেকে শ্রাদ্ধের কাজ করা। কবে দেবে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট?’’

‘‘কাল হতে পারে। ঠিক জানি না। অগ্নিদেবকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মন খারাপ করলে ফোন করো। ঠিকই আমরা দু-জন দুই প্রান্তে আটকে, কিন্তু ফোন নেট দুটোই তো আছে। চিন্তা করো না।’’ আশ্বাস দিল সৌরিক।

‘‘রুচিরাকে বলেছ?’’

‘‘খানিকটা। দিম্মা আর নেই বলেছি। খুনের ব্যাপারটা নয়। কথা বলো ওর সঙ্গে। ওর ভালো লাগবে। এ এক অসম্ভব পরিস্থিতি, যখন ফ্যামিলি দু-জায়গায় বিভক্ত’’

‘‘এখন মনে হচ্ছে এই রিফ্রেশার ট্রেনিংয়ে না এলেই হত। কেউ যদি একটু বলে দিত যে লকডাউন হবে। কে খুন করেছে?’’

‘‘সেটা নিয়ে পরে কথা বলব। খুব খারাপ লাগছে এ সময় তোমার পাশে থাকতে পারছি না। বিশ্বাস রেখ, মায়ের কাজে কোনও ত্রুটি থাকবে না। আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব। এখন নিজেকে সামলাও। এর গভীর অবধি যেতে হবে’’

‘‘হ্যাঁ। থ্যাঙ্কস সৌরিক’’ লাইন কেটে দিল অস্মিতা।

অস্মিতা ওকে মায়ের কাজ করতে যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে, ও আপ্রাণ চেষ্টা করবে সুষ্ঠুভাবে তা সম্পন্ন করতে। কতটা পারবে সেটা নির্ভর করছে অগ্নিদেবের ওপর।

অগ্নিদেবকে ফোন করল "অস্মিতা কোনও ভাবেই এসে পৌঁছতে পারবে না। সব যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ। মা কোনও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখত না। মনে হয় না কেউ আসবে। আমাকেই সৎকারের কাজ করতে বলেছে।"

"ওনার নম্বরটা পেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। আগের হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজে আছে, তবু আমি আবার পাঠিয়ে দিচ্ছি" সৌরিক জানে এটা প্রোটোকল। অগ্নিদেবকে অস্মিতার কাছ থেকে যাচাই করে নিতে হবে। ঠিকই আছে। নিয়ম তো সকলকেই মেনে চলতে হয়।

"পোস্ট মর্টেম কখন শেষ হবে?"

"এখন তো খুবই কম লোক নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। দু-দিন লেগে যাবে। এমনিতে একদিনেই হয়ে যায়। যেহেতু হত্যার আশঙ্কা এবং এত বড় সেলিব্রিটি, সেজন্যই একজন সিনিয়র ডাক্তার করবেন।"

"হয়ে গেলে আমাকে জানাবেন। আমি কি ওখানে যেতে পারি?"

"ব্যবস্থা করে দিতে পারি। পুলিশের গাড়ি আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে পুরো প্রোটেকশন নিয়ে যেতে হবে। আছে অপনার?"

"না"

"ঠিক আছে। যে পুলিস অফিসার যাবে তার হাতে পাঠিয়ে দেব নতুন একটা সেট"

"তদন্ত কিছু এগোল?" জিজ্ঞাসু সৌরিক।

"না, এখনও শুরু করিনি। এই কাজটা আগে শেষ করে নিই। রিপোর্টও হাতে পেয়ে যাব দু-দিনে। তখন নির্দিষ্ট পথে এগনো যাবে। এখন সবই নেটের মাধ্যমে করতে হবে। টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেল এই সব আর কী। তুমি দেখ এর মধ্যে ওনার আর কী কী খবর নিতে পার"

"হ্যাঁ, যতখানি পারি, দেখছি। আপনাদের কম্পিউটার এক্সপার্টরা ওনার কম্পিউটরের লগ-ইন ডিটেলস বার করতে পারবেন?"

"আমার কাছে ওনার ল্যাপটপ আর মোবাইল দুটোই আছে। ওনাদের বলব দেখে জানাতে।"

"আপনি যদি দয়া করে করে দেন। আমি ওনার সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে লগ-ইন করে দেখতে পারি। যদি কিছু সন্দেহজনক দেখি, অস্মিতাকে জিজ্ঞেস করে নেব। এখন ওর যা মানসিক স্থিতি, হয়তো সব মনে করতে পারবে না।"

অগ্নিদেব চিন্তা করল। সৌরিকের তো সফ্‌টওয়ারের একটা কোম্পানি আছে। ইউনিটেক ইউনিভার্সাল। আর সেটা তো লালবাজারের আউটসোর্সিং কাজে এনলিস্টেড। এখন পুলিশের কম্পিউটার বিভাগে সবাই কোভিডের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা নিয়ে ব্যস্ত, এই তদন্তে সময় আদৌ দিতে পারবে কি?

‘‘যথাসাধ্য চেষ্টা করব সহায্য করতে’’ অগ্নিদেব রাজি ‘‘এখন একটু ঢিমে তালে এগোতে হবে। মিডিয়া একবার আঁচ পেলেই হল। ফোনে ফোনে বিরক্ত করে ছাড়বে। এই বিপর্যয়ের সময় যা মোটেই কাম্য নয়’’

‘‘একদম ঠিক সিদ্ধান্ত’’ সৌরিক একমত। ‘‘সন্দেহ আছে ক’জন সৎকারে আসবে। যদি কেউ আসে, চিহ্নিত করা সহজ হবে, কারা ওর কাছের লোক।’’

‘‘তাতে ছেঁকে নেওয়াও যাবে কাদের প্রশ্ন করতে হবে। চলচ্চিত্র জগতে লোক তো আর কম নেই!’’ অগ্নিদেব নিজের ইনভেস্টিগেশনের কাজ যতদূর সংক্ষিপ্ত করার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে।

‘‘আশা করি, তদন্ত শিগগিরই শুরু হবে।’’

‘‘সেই আশাই করি। রিপোর্ট হাতে পেয়ে তোমাকে ফোন করব।’’ লাইন কেটে দিল অগ্নিদেব। অস্মিতার সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। ফোন করল ‘‘অগ্নিদেব চ্যাটার্জি, এসপি, বিধাননগর। আপনি নিশ্চয়ই অপনার মায়ের কথা শুনেছেন?’’

‘‘হ্যাঁ, সৌরিক সব জানিয়েছে’’

‘‘শুনলাম আপনি দিল্লি থেকে আসতে পারবেন না এই সীমাবদ্ধতার জন্য’’

‘‘হ্যাঁ। সব ফ্লাইটই তো বন্ধ’’

‘‘এখানে কোনও আত্মীয়-স্বজন?’’

‘‘সৌরিককে বলেছি, মা খুব একটা কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখত না। আমার অবর্তমানে ও-ই যাবতীয় কাজ নিয়ম মাফিক করবে’’

‘‘ঠিক আছে। ওনার একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে একটা অনুমোদনপত্র ইমেলে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন? আমি আমার ডিটেলস আপনাকে পাঠাচ্ছি। এটা আমাদের রুটিন... প্রচলিত রীতি’’

‘‘নিশ্চয়ই, আমাকে অপনার ডিটেলস পাঠিয়ে দিন। আমি ইমেল আর হোয়াটসঅ্যাপ দুটোতেই কনফার্মেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি’’

‘‘জানি না এসময় কী বলে আপনাকে সান্ত্বনা দেব’’

‘‘দরকার নেই। শুধু খুনিকে খুঁজে বার করুন। আপনার যে কোনও প্রয়োজনে আমি আছি’’

‘‘ধন্যবাদ! এখন রাখছি, আপনাকে সময় সময় জানাতে থাকব’’

বিষণ্ন মনে লাইনটা কেটে দিল অগ্নিদেব। এখন এই কোভিডের সময় বাড়তি কাজ এত, যে কম্পিউটার জানে এমন একজনকে পেলে ভালো হত। ডিজিটাল অনুসন্ধান করতে সহায্য করতে পারবে, যা এখন বিশেষ দরকার। লালবাজার এই খুনের তদন্তে এখন আদৌ জোর দেবে কিনা কে জানে। ফেলেও রাখতে পারে। বাড়তি কাজে অনীহা। ইউনিটেক ইউনিভার্সাল ওরফে সৌরিক ওই কাজটা ভালোই করতে পারবে। এখন তো ওর হাতে বেশি কাজ নেই। দোটানায় অগ্নিদেব। মোবাইল আর ল্যাপটপের হ্যাক করা ডাটা সৌরিককে দেবে? এই গুরুতর গোপনীয় তথ্য সরকারি সম্পত্তি। কিছু সময় নিল চিন্তা করে একটা উপায় বার করতে। কিছুক্ষণ পর মনে হল, ইউনিটেক ইউনিভার্সাল লালবাজারের আউটসোর্সিংয়ের অংশ। তা হলে ওই কোম্পানির কাছে সাহায্য চাওয়াতে কোনও ক্ষতি নেই। সৌরিকের প্রখর বুদ্ধি বলে দেবে কী কী লিংক খুঁজতে হবে। এই করোনার ভয়াবহতার মধ্যে ওর এত সময় নেই সব লিংক ঘেঁটে দেখার। ওর স্ত্রীর কাছ থেকে খবর নিয়ে দরকারি অদরকারি খবরগুলো বাছাই করতে সুবিধা হবে। তবে ডাটা সৌরিককে দেওয়ার আগে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য।

অগ্নিদেব কিছুটা আশ্বস্ত হল যে, কাজটা সৌরিকের হাতে তুলে দিতে পারবে। তাঁর পুলিশের চাকরি জীবনে তেমন কোনও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত রাখতে পারেনি। এই রহস্যটা যদি ভেদ করতে পারে তা হলে রিটায়ারমেন্টের আগে একটা পালক জুড়তে পারবে নিজের টুপিতে! কর্মজীবনে যে সম্মান কোনও দিন অর্জন করতে পারেনি।

***

ঐশিকার শেষকৃত্য নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন হল কাশী মিত্র ঘাটে। সৌরিক, অগ্নিদেব আর চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজনের উপস্থিতিতে। যৎসমান্য যে ক'জন আসবে বলেছিল, অগ্নিদেব তাদের পুলিশের গাড়িতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসেছে আবার পৌঁছেও দেবে তাদের নিজ নিজ কোয়ারানটিনে।

যারা ঐশিকাকে ফোন করেছিল অগ্নিদেব তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে মিডিয়া যেন খবরটা না পায়। মিডিয়া ওটা ব্যাবহার করে টু-পাইস কামিয়ে নিতে চাইবে। রহস্যজনক মৃত্যু আর করোনার ডাটা নিয়ে এত হৈ চৈ। তার মধ্যে সেলিব্রিটির রহস্যজনক মৃত্যু মিডিয়ার স্কুপ হতে পারে। এই লকডাউনে এসব উটকো ঝামেলা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

শেষকৃত্য সম্পন্ন হতে অগ্নিদেব অন্য দিকে শ্মশানবন্ধুদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর নোট করে রাখল। এঁরা নিশ্চয়ই প্রয়াত অভিনেত্রীর কাছের লোক। পরে এঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে।

''পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এসে গেছে'' অগ্নিদেব সৌরিককে জানাল।

''কী বলছে রিপোর্টে?''

“একটি মাত্র গুলির আঘাতে মারা যায়। সম্ভবত গুলিটা সাইলেন্সর সহ অস্ট্রিয়ান জি-লক ২২, ছোট পিস্তল থেকে। ডেডলি ওয়েপন। সাইলেন্সর থাকার জন্য চারপাশে গুলির আওয়াজ যাওয়ার চান্স কম”

“এমনও হতে পারে যে, ওই মারাত্মক অস্ত্রটা এখনও ওই বাড়িতেই রয়েছে। কোথাও গুঁজে রাখা হয়েছে। বাড়ি ভালোভাবে তল্লাশি করেছেন তো?”

“সেভাবে নয়। এই রিপোর্টের পর আরেকবার ভালো করে দেখতে হবে। তোমার অনুরোধে আশা করছি কমিপউটার এক্সপার্টরা পাসওয়ার্ড বার করতে পারবে। এখন অবশ্য এই প্যানডেমিকের জন্য তারা অন্য কাজে ব্যস্ত”

“বার করতে পারলে দয়া করে ডিটেলস মেসেজ করে দেবেন।”

“নিশ্চয়ই। অস্মিতা কী একটু সামলে নিয়েছে নিজেকে?”

“না, পুরোটা নয় এখনও। একজন পুরোহিত জোগাড় করতে পেরেছে। সে দিল্লির বাড়িতে শ্রাদ্ধর কাজ করে দিয়ে যাবে।”

“খারাপ লাগছে আজ এখানে উপস্থিত থাকতে পারল না।”

“ভাগ্য! এ ছাড়া আর কী বলব! কবে যে এই লকডাউন শেষ হবে, কে জানে! যেমন যেমন কাজ এগোবে আমাকে জানাতে থাকবেন। ওই পসওয়ার্ডগুলো যত তাড়াতাড়ি হাতে পাওয়া যায় তত তাড়াতাড়ি আমি ওই লিংকগুলো চেক করতে পারব অস্মিতার সঙ্গে।”

“আমার খাটুনি কিছুটা লাঘব হবে তুমি ওটা দেখে দিতে পারলে। অন্যদের সব কন্টাক্ট ডিটেলস নোট করে নিয়েছি, পরে দরকার হবে। এখন কেয়ারানটিন এনফোর্স আর বিপন্নদের প্রয়োজন মেটানোটাই মুখ্য কাজ”

অগ্নিদেবের দেওয়া পুলিশের গাড়িতে সৌরিক বাড়ি ফিরল। প্রথমে স্যানিটাইসারে হাত ধুয়ে, স্নান করে বারান্দায় এসে বসল ল্যাফ্রয়াগ অন দ রক্সের ডবল পেগ নিয়ে। আজকের দিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অস্মিতার হয়ে কাজ করাটা।

“শ্মশান থেকে এই ফিরলাম পুলিশের গাড়িতে। সব কিছু ঠিক মতো হয়ে গেছে” সৌরিক অস্মিতাকে ফোন করল।

“জানি না কী বলে ধন্যবাদ দেব। এটা তো আমার কাজ ছিল”

“দিও না। অন্তত তোমার অনুপস্থিতিতে কাজে তো লাগতে পারলাম। বাকি কাজটা শেষ হবে যেদিন ওই খুনিকে ধরতে পারব”

“তুমি?”

‘‘এই লকডাউনের হরেক কাজে অগ্নিদেব আটকে পড়েছে। তাই আমাকে ওর অর্ধেক কাজ করে দিতে বলেছে। আমার কোনও অসুবিধা নেই। হাতে তেমন কোনও কাজও তো এখন নেই। বাড়িতেই আছি, তবে তোমার সাহায্য লাগবে। কিন্তু প্রথমে শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হোক। ওখানে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে?’’

‘‘পুরোহিত সব জিনিসপত্র নিয়ে আসবে বলেছে। আমাকে ওর নির্দেশ মতো সব করতে হবে।’’

‘‘কাল কাজটা হয়ে যাক তারপর তোমার সঙ্গে বসতে হবে। একমাত্র তুমিই ঠিক লিংকগুলো বলতে পারবে।’’

‘‘যদি বুঝতে পারি কোনগুলো ঠিক...’’

‘‘চিন্তা করো না। একবার দেখতে পেলে আমিও কিছুটা সাহায্য করতে পারব।’’

‘‘এখন কী করছ?’’

‘‘এই তো স্নান সেরে ড্রিংক নিয়ে। রুচিরা ওর ঘরেই। ওকে ওখানে নিয়ে যাইনি। সময়টা তো ভালো না’’

‘‘আমি ওকে ফোন করছি। কাল কাজ হয়ে গেলে তোমাকে ফোন করব। এখন রাখছি।’’

সৌরিক তাকিয়ে রইল ওই ধোঁয়াশা রাতের আকাশে। চাঁদমামা কেমন এক কোণে পড়ে, বৃদ্ধ ভিখারির মতো। ঠিক ভবঘুরের ঝাপসা হয়ে আসা চশমার মতো। একটা সুতায় ঝুলছে ঝাপসা আকাশের ওড়না থেকে। যেন সব তারার দল ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে মনকাড়া পরমানন্দের জলসাঘর থেকে। শো বিজ দুনিয়ায় ঐশিকা উজ্জ্বল নক্ষত্র। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র এখন নিষ্প্রভ চাঁদ। মনে হচ্ছে ছোট ছোট তারাগুলো ওকে নিজেদের দল থেকে বার করে দিয়েছে।

কাল অস্মিতা প্রার্থনা করবে অমৃতলোকে মায়ের শান্তির জন্য। তাঁর নশ্বর শরীরকে একটাই গুলি দুনিয়ার ঝঞ্ঝা থেকে মুক্তি দিয়েছে। মায়ের এই ধরনের ভয়ঙ্কর মৃত্যু প্রাপ্য ছিল কিনা সেটা ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দেবে বিচারের জন্য।

মহাবিশ্বের সকল চাঁদ-তারাই খুব প্রিয়। শুধু তারারাই মাকে বাদ দিয়েছে। মৃত্যুটা এখনও রহস্যে ঘেরা। অজান্তেই অবিশ্রান্ত চোখের জল। অনুপস্থিতিটা বুকে মোচড় দিচ্ছে। সৌরিক আন্দাজই করতে পারবে না এই যন্ত্রণা কার দিকে ইঙ্গিত করছে। খুনি? ঐশিকার অজানা দিক, নাকি ওর কর্মজগৎ?

একটা ভীষণ অসোয়াস্তি, একটা ব্যথা, একটা হিমশীতল বিষাদ... সিঙ্গল মল্ট যা জুড়াতে অক্ষম। এখন যখন জগৎ থেকে বহু দূরে অমৃতলোকে, সৌরিকের দায়িত্ব সত্যের মূলে পৌঁছনোর।

***

পুরোহিত চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর অবধি অস্মিতা স্থির হয়ে বসেছিল। স্মৃতিচারণে সময়জ্ঞান ছিল না। সৌরিকের ফোনে সম্বিত ফিরল।

"সব হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ"

"কেমন হল সব?"

"ঠিকই ছিল" অস্মিতার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

"কখন শেষ হল?"

"এই আধঘণ্টা আগে"

"ফোন করলে না তো?"

"বিকেলে ফোন করব" অস্মিতা লাইন কেটে দিল।

এই আকস্মিক ব্যবহারে সৌরিকের বুঝতে অসুবিধা হল না, অস্মিতা মায়ের কথা ভাবছে। ওর কাছ থেকে যত দূর শুনেছে, অস্মিতাকে ঐশিকা দত্তক নিয়েছিল শিশু বয়সে। টুকুন থেকে নাম পাল্টে অস্মিতা। নতুন অস্তিত্ব। কোনও দিন সে সৌরিককে তার আসল মা-বাবার কথা বলেনি। সৌরিকও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেনি। খুব সম্ভব অস্মিতা অনেক ছোট ছিল, মা-বাবাকে মনে রাখার মতো জ্ঞানও হয়নি। সৌরিকের মনে হল এখন তাকে তার নিজের জায়গায় ছেড়ে দেওয়া উচিত, যতক্ষণ ও চায়।

সত্যি, অস্মিতা মায়ের চিন্তায় ডুবে ছিল। ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। এই ট্রেনিংয়ে না আসলেই হত। সে মায়ের শেষ কাজটুকু নিজে হাতে করতে পারত কলকাতায়। হয়ত মাকে খুন হতে হত না।

ঐশিকা না করেছিল "তুই চলে গেলে রুচিরাকে কে দেখবে?"

"সৌরিক সামলাতে পারবে। আমাকে তো কোম্পানির কথা মানতে হবে" যুক্তি দিয়েছিল অস্মিতা।

"যা ভালো বোঝ কর। ও সামলাতে পারলেই হল। আমার কাজ কম থাকলে রুচিরাকে এখানেই এনে রাখতাম" ঐশিকা এনিয়ে আর সময় নষ্ট করেনি।

শুধু যদি...

মা যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন ফ্লোর থেকে ঠিক সাড়ে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে আসত যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুল থেকে মেয়েকে ছুটির সময় তুলতে। কারও কোনও ওজর আপত্তির তোয়াক্কা না করেই। মা তখন টলিগঞ্জের সবচেয়ে বড় স্টার, টাকার মেশিন! তাই তাকে কেউ চটাতেও সাহস করত না। অস্মিতাকে খাইয়ে, একটু গল্প, একটু খেলাধুলো করে, পড়াশোনায় বসিয়ে আবার চলে যেত কাজে। মধ্যরাত পর্যন্ত, অনেক সময় তারও বেশি। আর সব আসল মায়েদের থেকেও অনেক বেশি ছিল।

ঐশিকা তার আউটডোর শুটের সময় ফেলত অস্মিতার স্কুলের ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে "এক সপ্তাহের জন্য সুইটজারল্যান্ড যাচ্ছি। যাবি?"

সেই ছোট্টবেলায় সুইটজারল্যান্ড! অস্মিতা আনন্দে লাফিয়ে উঠল! মায়ের সঙ্গে যাওয়ার উপরি পাওনা রাজকীয় ব্যবস্থা। এ ছাড়া যায়? হাতে একটু সময় পেলেই দুজনে বেরিয়ে পড়ত গ্রাইনওয়াল্ডে লেক বকলস্পি অথবা ওয়েনজেনের জংফ্রাও পাহাড়ের শ্যামল পাদদেশে ঘুরে বেড়াতে। আবার কখনও গার্ডায় পিজ বুইয়ে হাঁটতে। ক'জনের ভাগ্যে থাকে এমন সব জায়গা ঘুরতে যাওয়া, তা-ও নিখরচায়? ওই সব স্মৃতিগুলো মনে পড়ছিল এই বিচ্ছিন্নতার দিনে একাকী বন্দিদশায় নিজের ঘরে। সে তার অতি কাছের এক মানুষকে হারিয়েছে। তার পৃথিবী, তার বন্ধু, তার অতি আপন, তার রক্তাক্ত হৃদয়। এখন থেকে তাকে জীবনের চলার পথে চলতে হবে একা। একদম একা।

শ্রাদ্ধের যত অবশিষ্ট প্যাকেট ফুল ইত্যাদি পড়েছিল সেগুলো গুছিয়ে ঘুমোতে চলে গেল। আজ আর দুপুরে খেতে ইচ্ছে করছে না। ঘুম ভাঙল যখন, তখন প্রায় বিকেল। ধীর পায়ে ব্যালকনিতে। সিগারেট ধরিয়ে ডুবন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে। আজকে ধোঁয়াটাও কোনও স্বস্তি দিতে পারছে না। সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে ওই ফাঁকা ধোঁয়ায়। ছুড়ে ফেলে দিল সিগারেটটা। ফেলতে গিয়ে চোখ পড়ল ঝরে যাওয়া শুকনো পাতাগুলোয়। তার মনে হল ওই শুকনো পাতাগুলোই জীবনের ক্যানভাসটা স্বচ্ছ ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে! প্রতিজ্ঞা করল এই নির্বিকার প্রশান্ত বিচ্ছিন্নতার মাঝে তার বিষণ্ণতা থেকে বেরিয়ে, নতুন আলোয়, বসন্তের নতুন আবহে ফুটে উঠবে, গ্রীষ্মের খরতাপে জীর্ণ হওয়ার আগে। এই বাস্তবিক পরিস্থিতির জ্ঞান উদ্ভট অন্ধকারেও তার জীবনের সত্যিকারের ক্যানভাস।

সৌরিককে সাহায্য করতে হবে দোষীকে খুঁজে বার করতে। সে ছাড়া আর তো কেউ নেই যার ওপর ভরসা করা যায়। কালো ক্যাপ্রির পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে ফোন করল সৌরিককে ''সরি, অনেক সময় লেগে গেল মায়ের স্মৃতি কাটিয়ে উঠতে''

''সেটাই তো হওয়ার কথা''

''হ্যাঁ। সব কিছু ঠিকমতো হয়ে গেছে। এখন খুনিকে খুঁজে বার করা''

''অপেক্ষা করছি অগ্নিদেবের জন্য। আমাকে মায়ের কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড বার করে দেবে''

''দেবে?''

''কথা দিয়েছে। এখন এছাড়া ওর আর কোনও উপায়ও নেই। একবার আমি পেয়ে গেলে মায়ের ইমেল সোশ্যাল প্রোফাইল ঘেঁটে সম্ভাব্য লিংকগুলো খুঁজে বার করতে পারব। তুমি যেগুলো জান আমাকে বলে দিতে পারবে। মায়ের অ্যাকাউন্টস?''

''মানে?''

''মানে ওগুলো কী ওর একার নামে, নাকি তোমার সঙ্গে জয়েন্ট?''

''বেশিরভাগই জয়েন্ট। কয়েকটা হয়ত সিঙ্গল নামে থাকতে পারে। ঠিক জানি না"

''তুমি অনলাইনে ওগুলো খুলতে পার?''

‘‘কোনও দিন তো দরকার পড়েনি। আমাকে লগ-ইন ডিটেলস খুঁজতে হবে। সাধারণত ই-ওয়ালেটে রাখি’’

‘‘ইনভেস্টমেন্টস?’’ সৌরিক জিজ্ঞেস করল।

‘‘বেশিরভাগই মায়ের নামে, আমাকে নমিনি করা’’

‘‘উইল করেছে?’’

‘‘জানা নেই’’ আরেকটা সিগারেট ধরাল অস্মিতা।

‘‘ওর গত বছরের সব অ্যাকাউন্টসের সমস্ত ট্র্যানজ্যাকশনের পিডিএফ স্টেটমেন্ট পাঠাও’’

‘‘চেষ্টা করতে দাও’’

ও যদি অ্যাকাউন্টস খুলতে পারে তাহলে কিছু একটা তো বেরিয়ে আসবেই। বেশিরভাগ সঙ্ঘাত তো টাকাপয়সা নিয়েই হয়। কোনও অস্বাভাবিক ট্র্যানজ্যাকশন দেখলেই সেটা খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

‘‘ঠিক আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে জানাও। ওখানে লকডাউন কতটা স্ট্রিক্ট?’’

‘‘মিডিয়াতে যা দেখাচ্ছে তাতে নাম্বার্স হাই। কেজরি শক্ত হাতে ধরেছে’’

‘‘টেক কেয়ার’’ লাইন কেটে দিল সৌরিক।

***

পুলিশ হ্যাকার্সরা ঐশিকার কম্পিউটার মোবাইল ক্র্যাক করে ফেরত দিয়েছে। অগ্নিদেব অফিসের কাজে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে সেটা আর খুলে দেখা হয়নি। সেন্টার থেকে টেস্ট কিট পাঠানোর ফলে ভাইরাস ডিটেকশনের কাজ বহু গুণ বেড়ে গেছে। সরকার এখন হটস্পটগুলোকে লাল, কমলা আর সবুজ রঙে ভাগ করে দিয়েছে। প্রত্যেকটার নিজস্ব গাইডলাইনস। অগ্নিদেবের কাজ সেগুলোকে বাস্তবায়িত করা। যেহেতু তার এলাকা উঃ ২৪পরগনা লাল এলাকা বলে চিহ্নিত, কঠোর নজরদারি দরকার। সময় নেই ঐশিকার খুনের তদন্ত করার।

সৌরিককে অ্যাকাউন্টস ডিটেলস, ক্র্যাকড পাসওয়ার্ড সব হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে হ্যাকার্সদের রিপোর্টের একটা স্ক্যান্ড কপিও। শুধু কো-অপারেটিভের লোকদের সঙ্গে ফোনের কথা আর চ্যাট ছাড়া। ডিটেলস দেখার সময় হচ্ছে না। জেরার ফল মীমাংসাহীন। সবাই এক কথা বলেছে, তারা জানে ঐশিকা ওখানে থাকতেন, কিন্তু কদাচিত কথা হত ওর সঙ্গে। বিশেষ কারও সঙ্গে মিশতেন না, অপ্রয়োজনীয় উপদ্রব পছন্দ করতেন না। যেমন হয় চলচ্চিত্র জগতের লোকেরা। কেউই কোনও অপরিচিতকে ওঁর ফ্ল্যাট থেকে ঢুকতে বা বেরতে দেখেনি। কেউ ওঁর কোনও পরিচিতর ব্যাপারেও কিছু জানে না। দু-একজন বলেছে মেয়ে, জামাই আর তাদের মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে ওঁর বাড়িতে আসতে দেখেনি। ছোট্ট সংসারে কখনও মিডিয়াকে আপ্যায়ন করেননি। পরিচিতরা হয়ত অন্য কোথাও দেখা করত।

এতে বিশেষ কোনও সুবিধা হল না তদন্তের। এই বয়েসে ওঁর ফ্যানের সংখ্যা আগের চেয়ে কম হবে। প্রফেশনাল পরিচিতি মানে ইন্ডাস্ট্রির কিছু মুখ্য। বিচক্ষণ মহিলা নিশ্চয়ই। টলিগঞ্জের ম্যাটিনি আইডলের দিন থেকে আজ অবধি যখন টিকে ছিল নিশ্চয়ই দূরদর্শিতা ছিল।

বোঝা যাচ্ছে ঐশিকা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও অচঞ্চল চিত্তের মানুষ ছিলেন। মেয়ের পরিবার ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোনও যোগাযোগ সল্ট লেকের ফ্ল্যাট চত্বরে ছিল না। অগ্নিদেব ভাবল, হত্যাকারী নিশ্চয়ই তাহলে কর্মক্ষেত্র থেকেই হবে। চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে প্রচুর লোকের সঙ্গে ওঁর পরিচিতি। তার মধ্যে সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল তারাও। যদি তাই হয় তা হলে কত জন! কত দিনের ঘনিষ্ঠতা? কর্মক্ষেত্রের কারও সঙ্গে কি ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল? কোনও শর্ত? ওখানে কি কোনও গন্ডগোল হয়েছিল?

গভীর তদন্তের প্রয়োজন। এখন যেহেতু জাতীয় জরুরি অবস্থা চলছে তাঁর সময় বা প্রাণশক্তি কোনওটাই পর্যাপ্ত নয় যে প্রত্যেকটি লোকের খোঁজ করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে। মেয়ে বেশি পীড়াপীড়ি না করলে ওটা এখন তুলে রাখবে যত দিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ওটা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল যদি না কেউ খোঁচায়।

সৌরিক যদি কোনও সূত্র খুঁজে পায় তা হলে সেটা তলিয়ে দেখতে পারে। তা না হলে ওটা আপাতত তোলা থাক।

‘‘একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, আপনি একটা ছবি পাঠিয়েছেন ক্রাইম সিনের, আর কোনও ছবি আছে?’’ সৌরিকের ফোন।

‘‘হ্যাঁ, আছে ক’টা’’ অগ্নিদেব উত্তর দিল।

‘‘পাঠিয়ে দিলে ভালো হয়?’’

‘‘ঠিক আছে, দেব। কিছু পেলে জানিও। এই মুহূর্তে একটু বেশি ব্যস্ত লকডাউন এনফোর্সমেন্টে’’

‘‘অবশ্যই’’ ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে সৌরিকের মনে পড়ে গেল, ‘‘অস্মিতাকে যে নাম্বার থেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এসেছিল সেটা বার করতে পারলেন? আরেকবার পাঠাচ্ছি’’

ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান, আপাতত বাড়িতে লকডাউনের জন্য। ও যদি মূল সূত্রগুলো বার করে দেয় সুবিধা হবে, যখন কেসটাতে হাত দেবে। নিজের কাজের সুবিধার জন্য ওকে সব তথ্য দিলে ওর কাজ করতে সুবিধা হবে।

রাউন্ডে বেরতে যাবে এমন সময় ফোন ‘‘অগ্নিদেব চ্যাটার্জি?’’

‘‘হ্যাঁ’’

‘‘আমার কাছে ঐশিকার খুনির খবর আছে’’

‘‘আপনি কে?’’ অগ্নিদেব প্রশ্ন করল।

‘‘প্রাঞ্জল বাগচি’’

‘‘সে কে?’’

‘‘ফোনে বলতে পারব না। দেখা করে কথা বলতে হবে’’

‘‘এই লকডাউনের মধ্যে এখন অসম্ভব। আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিন। তারপর আমি অপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব’’

‘‘দেখা হলে ভালো হত...’’

‘‘বললাম তো এই লকডাউনের মধ্যে এলাকার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। আর পুলিশি কাজে এত ব্যস্ত বেরতেই পারব না’’

‘‘ঠিক আছে। আপনাকে ডিটেলস মেসেজ করে দিচ্ছি’’

ফোন ছেড়ে অগ্নিদেব ভাবল, এই প্রাঞ্জল বাগচি ব্যক্তিটি কে। সে আদৌ কোনও সূত্র কিনা সেটা পরের ব্যাপার। এখন কোনও ইচ্ছে বা সময়ই নেই ওর পরিচয় যাচাই করার। আগে তথ্য পাঠাক। যদি ঠিক মনে হয় তা হলে যা প্রয়োজন করবে। এখন সময় নষ্ট করা চলবে না। যত্তসব এলোপাথাড়ি সূত্র! এই প্রাঞ্জল যদি সত্যি কিছু উদ্‌ঘাটন করে, তাহলে তারও কোনও কারণ নিশ্চয়ই আছে। কোনও লাভ ছাড়া যেচে এসে উপকার করছে না। দেয়র ইজ নো ফ্রি লাঞ্চ!

মাথায় পুলিশ বেরেটা পরে বেরিয়ে পড়ল সান্ধ্য কাজে।

***

অস্মিতা জামা কাপড় ছেড়ে স্নানে ঢুকল। বাথটবের ঈষদুষ্ণ ফেনা, টেলিফনিক সাওয়ার তার দেহের গোপনাংশের গভীর গহ্বরগুলো পরিষ্কার করছে। প্রতিজ্ঞায় অতীতকে নতুন স্পর্শমণি দিয়ে আলতোভাবে ধুয়ে, শুধু তাজা কামরসের কামনা। সাবানটা গায় মাখতে মাখতে তার আবেশে ওই ঈষদুষ্ণ জলে তার দোল খেলানো শরীরটা ফেনার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে রাজকুমার সৌরিকের চিন্তায় হস্তমৈথুনে মাতল। ঝিলিক মারছে শরীরে। জ্যাকুজির ছটায় এতদিনের অ্যাবস্টিনেন্স মুক্তি পেল ক্লাইম্যাক্সের জলপ্রপাতে, কামনার সপ্তম মার্গের শিখর আনন্দে।

মোবাইলটা বেজে উঠল। ভেজা শরীরটায় তোয়ালে জড়িয়ে শোবার ঘরের বেড সাইড টেবিলের ওপর থেকে মোবাইলটা তুলল। স্বপ্নের রাজকুমার সৌরিকের ফোন ‘‘করছটা কী? এত দেরি হল!’’

আহ! অস্মিতা কি বলতে পারে সে কীসে ব্যস্ত ছিল, ‘‘স্নানে ছিলাম’’

‘‘এই দীপঙ্কর সেনের সম্বন্ধে আরেকটু কিছু বলতে পারবে?’’

দীপঙ্কর সেন! যাকে ও আঙ্কল বলে ডাকে। যবে থেকে মনে পড়ে তবে থেকে অঙ্কলকে দেখছে বাড়িতে আসতে। যখন মা শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকত ছোটবেলায় আঙ্কল ওকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যেত। সময় যেতে আঙ্কল ওর খুব প্রিয় হয়ে উঠল। লম্বা চওড়া সুদর্শন মানুষটা, চোখে পড়ার মতো গোঁফ,

সাজানো দাঁতের পাটি আর ব্যারিটোন গলার স্বরে একটা আকর্ষণ ছিল, যা ছোট-বড় সকলকেই চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত।

‘‘কাকু, আইসক্রিম খাব’’ বায়না করত ছোটবেলায়।

কাকুও ওমনি তাকে কোলে নিয়ে ড্রাইভ করে চলে যেত কাছের বাস্কিন রবিন্সে। একটা ওখানে দাঁড়িয়ে খেত। আরেকটা পরে খাওয়ার জন্য হাতে নিয়ে। আরেকটু বড় হতে, পার্কে হাটার সময় গোগ্রাসে ফুচকা খাওয়াও আঙ্কলের দৌলতে। সময়ের প্রবাহে ওই বন্ধন পারস্পরিক ভরসায় রূপ নিয়েছে। সম্মানও! যেন ওর পালক পিতা।

ডিজাইনার পোশাকের রপ্তানি। সঙ্গে প্রসাধনীর ব্যবসা। ধনী না হলেও, অবস্থাপন্ন। থাকত গল্ফ গ্রিন এলাকায় হরিপদ দত্ত লেনে। তাতে বাড়িতে আসা সুবিধা হত। মা ফ্রি থাকলে কাকু সিঙ্গল মল্টে চুমুক দিয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প করত। অস্মিতা কোনও দিনই আন্দাজ করতে পারেনি ওদের সম্পর্ক। ওপর থেকে বন্ধু মনে হলেও তার থেকে বেশি কিছু নিশ্চয়ই। যদিও কোনও দিন বন্ধুত্বের সীমা লঙ্ঘন করে মাকে আপত্তিজনক পরিস্থিতিতে দেখেনি। তার থেকেই অঙ্কলের জন্য ওর সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা। যাই হোক না কেন সামাজিক নিয়মের উল্লঙ্ঘন হয়নি। তাতে প্রতিবেশীরা যে ছেড়ে দিত তা নয়। কিন্তু অস্মিতা শিখে গেছিল কোন কোন কথা কানে তুলতে নেই।

অগ্নিদেব মায়ের মৃত্যু কনফার্ম করার পর, আঙ্কলকে ফোন করেছিল ‘‘কাকু, মা খুন হয়েছে’’

‘‘কী...ই...ই...!’’ শোনার পর কাকু আঁতকে উঠেছিল।

‘‘একটা মেসেজ এসেছিল হোয়াটসঅ্যাপে। সৌরিককে বলি চেক করতে, পুলিশ যাচাই করার পর ও কনফার্ম করল’’

‘‘কে পাঠিয়েছিল?’’

‘‘জানি না। হয়ত খুনি নিজেই’’

‘‘পাগল হলে নাকি?’’

‘‘এমনটাই হয়েছে কাকু’’

লাইনের ওপারে লম্বা নিস্তব্ধতা। কাকুর কথা হারিয়ে গেল। তাদের এতগুলো বছরের অন্তরঙ্গতা!

‘‘কাকু, বলতে পার কে এমন করতে পারে?’’

‘‘না রে মা’’ কাকু লাইনটা কেটে দিয়েছিল একটাও কথা না বলে।

অস্মিতা একটু অবাকই হল। কাকু তো আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। এই রকম একটা অবস্থায় ও আশা করেছিল কাকু আরও কিছু জিজ্ঞেস করবে। ও ধরেই নিল কাকুর একটু স্পেস লাগবে এই শকটা কাটিয়ে উঠতে।

‘‘হ্যাঁ, কী জানতে চাও?’’ জিজ্ঞেস করল সৌরিককে।

‘‘ওর তোমাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে’’

‘‘খুব কাছের মানুষ, ভীষণ অন্তরঙ্গ। ঠিক কী তা বলতে পারব না। ফিজিক্যাল নয়, বরং মানসিক। আমার বাবার মতো’’

‘‘কোনও কিছু অস্বাভাবিক লেগেছে এতদিনের পরিচিতিতে?’’

‘‘না। একটাই অদ্ভুত, মায়ের কথা শোনার পর কিছু জিজ্ঞেস করল না। চুপ করে ফোন কেটে দিল’’

সত্যিই অদ্ভুত। সৌরিক ভাবতে পারছে না, এত কাছের একজন এই খবরের পর কৌতূহলী কেন নয়। ওর কি কোনও হাত আছে এতে? নাকি এতই মর্মাহত যে আর কথা চালিয়ে যেতে চায়নি। কোনও একটা হবে। বুঝতে পারছে না। ওর থেকে আবার কিছু না শোনা পর্যন্ত আপাতত সন্দেহের তালিকায়।

‘‘তুমি ওকে এখন আর ফোন করবে না। ওর ফোনের অপেক্ষা কর’’ সৌরিক বলল।

অবাক অস্মিতা জিজ্ঞেস করল ‘‘কেন? কিছু কারণ আছে?’’

‘‘যা বললাম তাই কর। ওর এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ তো বার করতে হবে’’

‘‘কেন তুমি কি ওর হাত দেখছ এর মধ্যে?’’

‘‘রুল আউট করতে হবে তো’’ সৌরিক ফোন ছেড়ে দিল।

ঐশিকার সমস্ত ডিটেলস না জানা পর্যন্ত কাউকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যাবে না। এটা অস্মিতা হজম করতে পারছে না। কিন্তু কিছু করার নেই। ও তো আর প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়। এই জরুরি অবস্থায় যতক্ষণ অগ্নিদেব অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকবে সৌরিকের ওপরেই তদন্তের দায়িত্ব।

মায়ের খুনিকে ধরতে হলে অস্মিতাকে আবেগ কাটিয়ে উঠতে হবে। ন্যায়ের মানদণ্ড বেশিরভাগ সময়ই ব্যক্তিগত আবেগের ঊর্ধ্বে।

***

আর সময় নষ্ট না করে সৌরিক মন দিল ঐশিকার ডিটেলসে। ওর জি-মেল অ্যাকাউন্ট খুলতে গিয়ে মনে পড়ল অগ্নিদেবকে ওর মোবাইল লগ-এর কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি।

‘‘আপনাকে মোবাইল লগের কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি কি আমাকে একটা পিডিএফ প্রিন্ট পাঠিয়ে দেবেন?’’ সৌরিকের ফোন অগ্নিদেবকে।

‘‘ওগুলো আমার ভোডাফোনের মেল-এ আছে। এখন রাউন্ডে। বাড়ি ফিরে পাঠিয়ে দেব। হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাকাউন্টসের আর মেল পসওয়ার্ডের স্ক্যান্ড কপি পাঠানোর সময় ওটা বাদ পড়ে গেছে’’

‘‘ঠিক আছে। যখন সময় পাবেন’’, সৌরিক ফোন কেটে দিল।

সৌরিক মেলগুলো ভালো করে দেখছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক মেল যেগুলো চেনে না। ব্যাংক অ্যাকাউন্টসের প্রতিটা ট্র্যানজ্যাকশনের মূলে গিয়ে চেক করছে, কোনও অস্বাভাবিকত্ব আছে কি না। কয়েকটা নজর কাড়ল। দীপঙ্কর সেনের কাছ থেকে। ১০ লাখ ওর নামে ট্র্যান্সফার। সংশয়, অস্মিতা আদৌ এই ব্যাপারে কিছু জানে কি না। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। কিছুই জানে না। আরেকটা ট্র্যানজ্যাকশন... কোনও এক রাস্তগিকে ১ লাখ দিয়েছে। এই রাস্তগিটা কে? আরেকটা ট্র্যান্সফার হয়েছে ৫ লাখ। কোনও অখিলেশ সোনির নামে পাঠানো। নামটা চেনা লাগল। মনে করার চেষ্টা করছে। কোথায় শুনেছে নামটা? আহ! ওই তো... সবচেয়ে বড় প্রোডাকশন হাউস চামুণ্ডেশ্বরীর একজন মালিক। নিশ্চয়ই কোনও কনট্র্যাক্ট পেমেন্ট হবে সিনেমার জন্য। তা-ও চেক করতে হবে।

অস্মিতাকে ফোন করল, "রাস্তগি নামে কাউকে চেন?"

"নামটা চেনা লাগছে। মনে করতে পারছি না কোথায় শুনেছি" অস্মিতা টেলিভিশনের সাউন্ডটা মিউট করে দিল।

"মনে পড়লে বোল। অখিলেশ সোনি?"

"চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মসের মালিক"

"তোমার মা কি ওদের কোনও প্রজেক্টে কাজ করছিলেন?"

"বলতে পারব না। মা তো অনেক ছবিতে কাজ করছিল। ওরা তো কলকাতার ওয়ান অফ দ্য লিডিং হাউস। সিনেমা না হয়ে ওয়েব সিরিজও হতে পারে। যা শুনেছি, সিনেমার বাজার মন্দা যাচ্ছে। বেশিরভাগ সিনেমাই বক্স অফিসে ডুবেছে। মায়ের মতো পুরনো লোকেরা এখন আয় ঠিক রাখতে ওয়েব সিরিজের দিকে ঝুঁকছে। মা বাংলা সিরিয়ালে কাজ করতে ভীষণ অপছন্দ করত"

"কোনও নির্দিষ্ট কারণ?"

"মা বলত ওগুলো কোনও কাজের নয়। চরিত্রের ওপর বেশি নজর দিত"

"রাস্তগির কথা মনে পড়লে জানিও" সৌরিক ফোন রেখে দিল।

যাক। অন্তত তিনটের খোঁজ মিলল। কল লগ পেলে আর কত পরখ করে দেখতে হবে! আপাতত এই কটা নিয়েই কাজ করা শুরু।

জি-মেলটা খুলে দেখতে বসল, সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় কি না। প্রাঞ্জল বাগচির কাছ থেকেও একটা মেল ... '*রাস্তগি আপনাকে শেষ করে দেবে*'। এ নিশ্চয়ই সে যাকে ঐশিকা ১ লাখ দিয়েছিল। এই রাস্তগিকে পরখ করতে হবে ভালোভাবে। আরেকটা মেল 'হ্যাপলেস লোনার' নামে... '*আপনি আপনার অতীতকে অস্বীকার করতে পারেন না*'। অবশ্যই ছদ্মনাম, পরিচয় গোপন করতে। মানুষটাকে না-হয় পরে চেনা যাবে, কিন্তু মেসেজটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐশিকার নিশ্চয়ই একটা অজানা অতীত আছে। কিন্তু অস্মিতার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝল... ও কিছুই জানে না। সুতরাং এটাও যাচাই করতে

হবে। সৌরিক স্ক্রল করতে থাকল মেলগুলো। আরেকটা মেসেজ কোনও এক অধীর বিশ্বাসের *‘টাকা দাও, না হলে অভিনয় বন্ধ’* এই অধীর বিশ্বাসটি কে? নিশ্চয়ই চলচ্চিত্র জগতের কেউ। কীসের টাকা চাইছে ও? যেহেতু দুটো মেলই ডিলিট করা হয়নি তার মানে এগুলো জাঙ্ক মেল নয়। মেল প্রেরক ঐশিকার পরিচিত।

অস্মিতার মাকে যতটা অনিন্দনীয় মনে হয়, ততটা বোধহয় নন। তাঁর কর্মজগতের চাকচিক্যের বাইরে, অস্মিতাকে বড় করা, দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মিশ্রণ! প্রত্যেকটা লিংক ভিন্ন ভিন্ন জগতের। হয়ত এই কোয়ারান্টিনে সবগুলো লিংক পরখ করে উঠতে পারবে না। তবু চেষ্টা করা। যদি না পারে তখন অগ্নিদেব তো আছেই, ধাঁধার খুঁজে না পাওয়া টুকরোগুলো বসিয়ে দেবে।

ঐশিকার খুনের অনেক কারণ থাকতে পারে। সেগুলো ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের বা বাইরের। সম্ভাব্য হুমকি সব সময় খুনের রূপ নাও নিতে পারে। ওকে অপ্রাসঙ্গিক ছেঁটে ফেলে আসল দোষীকে খুঁজে বার করতে হবে।

এ তো বিশাল কাজ!

সৌরিক কম্পিউটার বন্ধ করে স্নানে গেল। অল্পবিস্তর ড্রিঙ্ক না করলে মাথা কাজ করবে না। স্নান করে ফ্রেশ হয়ে ডাবল কারডু বরফে নিয়ে এসি লাউঞ্জে। পেছনে চলছে সান্ধ্য রাগ যামিনী। দু’পেগ নামানোর পর মাথার ঘুমন্ত কোষগুলো নড়েচড়ে উঠল। আগে কেন চিন্তা করেনি? অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আলোর ঠিকানা দেখতে পাচ্ছে। ডাকছে পরের ধাপে পা রাখতে।

***

ডিউটি শেষ করার পর অগ্নিদেব বাকি দিনটা নিজের মতো কাটাবে বলে মনস্থির করল। সে খোলা জানলার সামনে দাঁড়াল। দূরে সূর্যাস্ত, আকাশটা কালচে। আধো অন্ধকারে ছেয়ে আছে চারদিক। সন্ধের দিকে তাকিয়ে একটা ক্লান্তি আছন্ন করল তাকে। তারাগুলো এক একটা অংশ আলোকিত করে রেখেছে নিজ ঔজ্জ্বল্যে। অন্ধকারটা মিষ্টি হাওয়ায় ছড়িয়ে থাকা মেয়েদের চুলের মতো। চকচকে তারাগুলোর অখণ্ড গভীরতা এক অন্য আবেগ জাগাল, যা সারা জীবনেও পায়নি।

পুলিশের কাজ করার একটা বড় সুবিধা কখনওই মদের কমতি নেই, এমনকি সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকলেও। এই লকডাউনের মধ্যেও সাকরেদরা ঠিক এক বোতল ‘আমরুত’ সিঙ্গল মল্ট পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ ভুজিয়ার সঙ্গে বেশ জমবে। ভুজিয়া এসেছে অনলাইন অর্ডারে বিগ বাস্কেট থেকে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় গুছিয়ে বসল। সামনের খালি রাস্তার দিকে তাকিয়ে। ওপরওয়ালারা নিশ্চয়ই তার কাজে খুব খুশি হবে। এলাকায় নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করছে

ঠিকঠাক। এটাও ঘটনা, তার এলাকায় মোটামুটি সকলেই শিক্ষিত। তাই যা বলা হয় তারা মেনে চলে। অন্যান্য জায়গার মতো নয়, মানুষকে ঘরে রাখার জন্য যেখানে লাঠি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

ড্রিংকে চুমুক দিয়ে অগ্নিদেব ফিরে গেছে কলেজের দিনগুলোতে। ষাটের শেষ দিকে দাদা নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে, যখন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল আর জঙ্গল সাঁওতালদের নেতৃত্বে আন্দোলন সারা বাংলাকে তোলপাড় করছে। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে মাওইজম কমিউনিজমের স্বতন্ত্র মৌলিক রূপের ভূষণে নতুন ব্যাখ্যা পায় চারু মজুমদারের 'হিস্টোরিক এইট ডকুমেন্টস' চার্টারে। চারু মজুমদার তাঁর ভাবাদর্শ লিপিবদ্ধ করেন। যেখানে ভারত সরকারকে এক কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন। ওই আন্দোলনকে উৎখাত করতে তখন সরকার বদ্ধপরিকর।

দাদা ঋদ্ধদেবর সঙ্গে অগ্নিদেবও ওই মন্ত্রে তখন দীক্ষিত। অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য। চিনাদের 'অপারেশন স্প্রিং থান্ডার' তখন থেমে গেছে। সত্তরের গোরায় দাদার হাত ধরে সক্রিয় রাজনীতিতে অগ্নিদেবের পদার্পণ। সেই সময় ভারত সরকার ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে 'অপারেশন স্টিপল চেজ' নামে অভিযান শুরু করে নকশাল আন্দোলনের যবনিকা টানতে। সেই অপারেশনে বহু নকশালকেই হয় গ্রেফতার করা হয়, না হয় নির্মমভাবে মেরে দেওয়া হয় কোনও রেকর্ড বা তথ্য না রেখেই। তাতে অগ্নিদেব গ্রেপ্তার। দাদা মারা যায়। শুধু এক কমরেডের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য।

আম্রুতে চুমুক দিতে দিতে সে সব স্মৃতি এসে ভিড় করছে। কী অকথ্য অত্যাচার! প্রচণ্ড যন্ত্রণায় দাদার মৃত্যু। নিজেও হাজতে অত্যাচারে জর্জরিত। সেই অত্যাচারের স্মৃতি রোমন্থনে চোখে জলের বন্যা। জেলের কালকুঠুরিতে অবসাদ। মেধাবী অগ্নিদেবের তখন অন্ধকার ভবিষ্যৎ। দাদাকে কে মেরেছিল বা তাকে কে গ্রেফতার করেছিল, তার থেকেও বেশি, এই অঘটন যে ঘটিয়েছিল তাকে সে ক্ষমা করতে পারেনি।

অরুণিমার হারিয়ে যাওয়া মুখটা এখনও উজ্জ্বল। মাঝরাতের কলকাতার মিঠে হাওয়ায় অরুণিমার নরম স্পর্শ, ওদের দুজনের ঐশ্বরিক মিলনানন্দ, সেই কোমল মুহূর্তগুলো, এই জীবনের শেষ প্রান্তে এক অভূতপূর্ব শান্তির প্রলেপ। তখনকার ছন্নছাড়া জীবনে অরুণিমা ছিল একমাত্র সূর্যকিরণ। আঠারো বছর বয়েসে অগ্নিদেব প্রেমে পড়েছিল অরুণিমার। তার ভাবাদর্শের তাগিদের মধ্যেও অরুণিমার সান্নিধ্য আঁকড়ে থাকার জেদ তার কম বয়েসের দৃঢ়তার সাক্ষর।

একটা সেমিনারে দেখা হয়েছিল অরুণিমার সঙ্গে। তখন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্স। খুব ভালো কবিতা লিখত, অনেক সময় তাকে নিয়েও। লালপেড়ে শাড়ি পরে কফি হাউসে বসে ব্ল্যাক কফি হাতে নিয়ে রোম্যান্টিকটায় যেন দেবী সরস্বতী। বৌদ্ধিক রোম্যান্স যেন ম্যাজিক। সঙ্গে উপরি পাওনা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গদার, ত্রুফোর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ঢাকুরিয়া লেকের শান্ত নির্জনে ওর নরম তুলতুলে পায়রার মতো বুকে স্নেহসঞ্চার করতে গিয়ে মনে হত, ও যেন জাগতিক পাওয়ার

আঁতুড়ঘরে। তাদের মিষ্টিমধুর প্রেমের ছন্দ যেন নতুন সুরে তাদের ভালোবাসার সাক্ষর। মনে পড়ে সে সময় বিনিদ্র রাত্রির প্রচণ্ড কামোচ্ছ্বাসের স্বর্গে সে তখন ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে।

প্রেম সেদিন ভিন্ন ভিন্ন সুর-তাল-লয়ে ঝংকার তুলেছে। কিন্তু আজ অবধি তাকে বোধগম্য কোনও কনসার্টে গাঁথতে পারল না। অরুণিমার উষ্ণ ঠোঁটের চুম্বন তার কোমল হৃদয়ে, দেহে কামনার সুনামি বইয়ে দিত। একদিন ইডেনের প্যাগোডার নিরালায় ওর অরগ্যাজমিক স্বপ্নের বাস্তব পেল অরুণিমার নরম তুলতুলে কবুতর বুকের খাঁজে। অরুণিমার প্রতিবেদন ওকে কাঙ্ক্ষিত কামনার সুখে ভাসিয়ে দিয়েছিল অনন্ত সোনাটার স্বপ্নে।

সকলের অন্তরেই এককোণে একটা সূক্ষ্ম একাকীত্ব বিরাজ করে। আমাদের নশ্বর রূপের প্রাচুর্যের প্রকাশ। এই বয়েসে অতীত প্রেমের বিভিন্ন ইঙ্গিত এড়িয়ে, জীবন নিজের নিরলস গতিতে বিবর্তিত হচ্ছিল। সেই নিভৃত মুহূর্তের ধামাচাপা দেওয়া অতীতটা হঠাৎ আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণ করে আত্মার অন্তর্দর্শনে। বিভিন্ন সময়ে ধ্রুবতারার বৈচিত্র্য তারই ইঙ্গিত। এতগুলো বছর পার হয়ে ভুলেই গেছে গন্তব্য। এখন শুধু বাস্তবই তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

যখন উদ্দীপনার ঢেউ হৃদয়ে আছড়ে পড়ে, পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চমানের মল্ট এক লহমার জন্য হলেও তার মস্তিষ্কে নাড়া দেয়। 'অপারেশন স্টিপল চেজ'এর সময় ঋদ্ধদেবকে গুলি করা হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের লোধাশুলির জঙ্গলে। রেড করিডোরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গাগুলোর একটা। যখন পুলিশ লোধাশুলিতে হানা দেয়, গ্রেফতার হয় গুপ্ত আশ্রয় থেকে। কেবলমাত্র একজনের বেইমানির জন্য।

লোধাশুলি যাওয়ার দুদিন আগে অরুণিমার ফোন ''অনেকদিন দেখা হয়নি। একবার দেখা করবে?''

''আমি তো এখন আন্ডার কভার''

''বাবা মা দিল্লিতে একটা বিয়েবাড়িতে গেছে। আমি একা বাড়িতে। চলে এস না। ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে যেতে পারবে'' অগ্নিদেব অরুণিমার সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারল।

অগ্নিদেব অনুরোধ ঠেলতে পারেনি। বিশেষ করে, যখন জানা নেই কত দিন, কলকাতা থেকে দূরে ঘন জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। পুলিশ আঁচ পাওয়া মানে আরও উত্তরে বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার পালাতে হবে। ওদের কোনও ধারণাই তখন ছিল না এ বনবাস কদ্দিনের।

এই অনিশ্চিত যাত্রার আগে অরুণিমার বিদায় আলিঙ্গনের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনি।

দাদাকে বলেছিল ''শুধু আজ রাতটার জন্য...''

''যাস না। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। কলকাতার বাইরে চলে গেলে ওদের খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে''

''চিন্তা করিস না। এখন তো রাত। ছদ্মবেশে যাব। কেউ চিনতে পারবে না''

"তুই শিওর?"

‘‘একদম। চিন্তা করিস না। উপযুক্ত সতর্কতা নিয়েই যাব’’

দাদার সতর্কবাণী উপেক্ষা করে অগ্নিদেব সে রাতে অরুণিমার লেক গার্ডেনসের বাড়িতে। কল্পনাই করতে পারেনি, সেই রাত তার জীবনের সব থেকে মধুময়, সঙ্গে সব থেকে দুঃখের রাত হবে। ধ্রুবতারা তার জীবনে এক নতুন পথ নির্ধারণ করেছে। শুধু কমরেডরা ছাড়া আর কেউই জানত না, কলকাতা ছেড়ে লোধাশুলি যাওয়ার এই শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত।

‘‘দ্য লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন কলকাতা’’ তার জীবনের প্রথম কামসূত্রই শুধু ছিল না, অরুণিমার সঙ্গেও শেষ স্বর্গসুখ। রাত এগারোটার পর চাদর মুড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে ওর বাড়িতে। একটা স্বচ্ছ হালকা নেগলিগি পরা অরুণিমা সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকিয়ে চুমুর উষ্ণতায় ভরিয়ে দিয়েছিল ওর ঠোঁট। এতদিনের বিরহে তাদের শারীরিক আকাঙ্ক্ষা বন্ধনহীন। ভাসিয়ে দিয়েছিল ইরসের ঝর্নার প্লাবনে।

ল্যাম্পশেডের মৃদু আলোয় বিবস্ত্র অরুণিমা বাথরুম থেকে সোজা অগ্নিদেবের শোয়া দেহে। সরে যাওয়া পর্দায় ঘরে আসা জ্যোৎস্নার আবছায়া আলো-আঁধারি, দুটি মিলনোন্মুখ আত্মার আবেগকে পবিত্রতায় ধৌত করে দিয়েছিল। মনমুগ্ধকর তারাখচিত স্বপ্ন থেকে বর্তমানে।

ওর ঋজুতায় ধীরে ধীরে শৃঙ্গার। গলায়, গালে চুমু। ক্রমশ অরুণিমা তার সমস্ত দেহ দিয়ে মর্ষণে মিশিয়ে দিতে চাইছে নিজেকে তার আলিঙ্গনে। ঠোঁটে ঠোঁট। ক্রমশ উত্তেজিত। ওর আঙুল ওঠানামা করছে অগ্নিদেবের পুরুষাঙ্গে। আরুণিমার যাদু স্পর্শে আরও বলিষ্ঠ তার পৌরুষ। ভাসিয়ে দিতে কামার্ত স্বর্গলোকে। স্তন নিয়ে খেলা করতে করতে অরুণিমাই ওর বক্ষযুগলের খাঁজে আশ্রয় দিল তার ঋজু পৌরুষকে। অগ্নিদেবের ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, অরুণিমার কামনামধুর ঝাঁকুনি, আবেগে ভরপুর গোঙানি ক্রমশ নিয়ে যাচ্ছে কামনার ঊর্ধ্ব মার্গে। বন্ধ চোখে অরুণিমা অনুভব করছে ওর ভগাঙ্কুরে অগ্নিদেবের স্পর্শ। অবশেষে ওর উন্মীলিত যোনিদ্বারে অগ্নিদেবের ঋজু পুরুষাঙ্গের প্রবেশ। তার ওঠানামায় দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে ভাসিয়ে দিচ্ছে দু-জনকে কামনার চূড়ায়, নৈসর্গিক তৃপ্তির বাঁধভাঙা স্ফুরণে। জাগতিক সন্তুষ্টির যুগল বন্যার জলোচ্ছ্বাসে। মুক্তির আনন্দে অরুণিমা আঁকড়ে ধরেছিল অগ্নিদেবকে, ওর জাগতিক পরিতৃপ্তির মধুময় অধ্যায়ে।

সে সব দিন আর কোথায়!

সেই স্বর্গীয় সুখ যা অনুভব করেছিল সংশোধনবাদের আন্দোলনের বাঁকা পথে, তা এখন মিইয়ে গেছে। দাদাকে লোধাশুলিতে গুলি করার পর, একই অপারেশনে তাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে গ্রেফতার করে। সংশোধনবাদের আন্দোলন হারিয়ে গেল তার নিজস্ব চিতায়। ঋদ্ধদেবের মৃত্যু, নিজে হাজতে, কোনও আশার আলো নেই। আন্দোলনের ব্যর্থতার থেকেও দাদার মৃত্যু তাকে বেশি পীড়া দেয়। সেদিনের পর আর দেখা হয়নি অরুণিমার সঙ্গে। মনের মণিকোঠায় আজও প্রাণবন্ত সেই স্মৃতি।

যখন গারদের অন্ধকূপ থেকে বেরল, তখন কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায়। আর অরুণিমাকে খুঁজে পায়নি। বিয়ে করে অ্যামেরিকায়। নাগালের বাইরে মায়াবী স্বচ্ছলতার মরূদ্যানে। চোখের সামনেই দুনিয়াটা ভেঙে পড়ল। কেরিয়ার, ভাবাদর্শ, হারিয়ে যাওয়া প্রেম, দাদার অকাল মৃত্যু, জীবন তাকে নোঙরবিহীন ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করল।

তাড়াতাড়ি আরও দু পেগ গিলে নিল। আর্কাইভের স্মৃতিগুলো উঠে এলেই বুকটা মোচড় দিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বহু বছর পার হয়ে গেছে, এখন আর ও নিয়ে আক্ষেপ করে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে ওসব দূরে সরিয়ে বর্তমানের ওপর নজর দেওয়া শ্রেয়।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজগুলো দেখল। কথা মতো, প্রাঞ্জল বাগচি এক বিশদ বিবরণ পাঠিয়েছে ঐশিকা রায়ের সম্ভাব্য খুনির। তার নামও নিয়েছে অথচ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বেশ অস্পষ্ট। এবার ‘আমরুত’ কাজ শুরু করেছে। নেশার ঘোরে যুক্তিসংগত নির্ণয় এখন অসম্ভব। কাল যখন সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারবে তখনকার জন্য তুলে রাখাই শ্রেয়।

বারান্দায় মৃদু বাতাসের ছোঁয়ায় কেমন একটা ঘোর এসে গেল। ‘আমরুত’ চড়ে বেড়াচ্ছে মস্তিষ্কের শিরা উপশিরায়। আচ্ছন্ন তন্দ্রায় গা ছেড়ে দিল।

***

মাইক্রোওয়েভে অস্মিতা ভেজিটেবল অ-গ্র্যাটিন গরম করতে বসাল। রোজ রান্না করা পোষায় না। সকালে বেশ খানিকটা রেঁধে রেখেছে, যাতে অন্তত দু-দিন চলে যায়। মায়ের কাজ হয়ে যাওয়ার পর একটা শূন্যতা অনুভব করছে। অর্থগোনাল ইস্যুগুলো তুলে রাখাই ভালো। ডিনার শেষে সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায়। সামনের জনশূন্য রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে। স্থবির, রাতের মহাকাশের দিকে তাকিয়ে একটা প্রগাঢ় শোক তাকে আচ্ছন্ন করল।

আকাশের জীর্ণ মেঘগুচ্ছ এধার ওধার ভেসে বেড়াচ্ছে। নবমীর বাঁকা চাঁদ যেন লুকোচুরি খেলায় মত্ত। আকাশের রামধনু রং এখন গাঢ় অন্ধকারের আচ্ছাদনে। মাঝেমধ্যে নিজের ঔজ্জ্বল্যে মায়াবী, অস্পষ্ট। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয় ড্রাগনের মতো গ্রাস করেছে উজ্জ্বল চাঁদটাকে। মৃত্যু আশংকায় চাঁদটা ভয়ে কেঁপে উঠল। ঠিক শীতের নিষ্ক্রিয় ফার্নের মতো, তার ভীত সন্ত্রস্ত গভীরে। সেই গভীরের ঘূর্ণাবর্তে একটা আশ্রয় খুঁজছে। সৌরিক, আঙ্কল, অন্যান্যদের থেকে কত দূরে। হাতড়ে বেড়াচ্ছে অতল অন্ধকারে আশ্রয়ের খোঁজে। সেখানেও ধোঁয়াশা, মেঘের দাপাদাপি। ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতায় আতঙ্কিত বেরোবার পথ খুঁজছে। সব পথ বন্ধ। চাঁদের মতো আতঙ্কিত একাকীত্বে নিজের গভীরে খুঁজল। মেঘরূপী ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল।

রাতের বাতাসও তার সন্ত্রস্ত আত্মাকে জিরোতে দিচ্ছে না। স্থির বসে তার উৎস সন্ধানে। বেশ কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল অস্বস্তির মূলে ঐশিকার চলে যাওয়া। মা যেখানেই থাকুক না কেন, মায়ের

উপস্থিতিই তার জোর, তার কবচ, তার অদৃশ্য ব্যক্তিত্ব সহায়। এখন সে জায়গাটা খালি হওয়াতে সে বড় অসহায়। মনে পড়ে, যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে, ঐশিকা তাকে আগলে রেখেছে। পরিবার ছাড়া ঐশিকাই ছিল ওর একমাত্র অপরিহার্য অংশ। স্কুল যাওয়ার আগে অবধি ঐশিকাই ছিল তার মা, বাবা, তার পৃথিবী!

"তোমার বাবা কোথায়?" অন্যান্য বন্ধুরা জিজ্ঞেস করত।

"জানি না" অস্মিতা ওদের থামানোর চেষ্টা করত।

কিন্তু কতদিন আটকে রাখা যায়? শেষে একদিন কপালে গালি "তুই একটা জারজ!"

ওরা কী করে তাঁকে এভাবে অপমান করে? মা তো স্বয়ং দেবী।

সবে ঐশিকা সারাদিনের শুটিং থেকে বাড়ি ফিরেছে। মেক আপ ধুয়ে আসতেই চোখের জলে বন্যায় অস্মিতা এসে জড়িয়ে ধরল।

গভীর যন্ত্রণায় জিজ্ঞেস করল "আমার বাবা কে?"

ঐশিকা জানত কোনও একদিন তাকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। যতদিন পারা যায়, ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এই প্রগতিশীল সমাজেও একা ছেলে মেয়ে মানুষ করার নেতিবাচক প্রভাব। সারোগেসি হোক বা ডিভোর্সি, কোনও মহিলাই এর থেকে রেহাই পায় না। বৈবাহিক সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সমাজের স্তম্ভ। এর অন্যথা হলেই অস্বাভাবিক। তার ওপরে যদি মা কুমারী হয়, তাহলে তো কথাই নেই!

যদিও ঐশিকা তার পরিবারকে বাইরের জগৎ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছে তা-ও তার পেছনে, লোকেদের ফিসফাস ঠিকই কানে আসত। যদিও কারও সাহস হত না টলিউডের সার্বভৌম সাম্রাজ্ঞীর সামনে কোনও কথা বলার।

সাড়ে পাঁচ ফিটের স্লিম আকর্ষণীয় এই অভিনেত্রীর একটা অটুট অদৃশ্য বর্ম ছিল, যা কেউ ভেদ করতে পারেনি। এমনকি প্রোডিউসাররাও নয়। সে তো কারও সঙ্গে শুয়ে এই জায়গায় পৌঁছয়নি। তাই তার প্রতিপত্তিও সেরকম। তার ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, আচরণ তাকে সাম্রাজ্ঞীর সিংহাসন দিয়েছে যা দিয়ে সে টলিউডে রাজত্ব করতে পারে। ঐশিকা বড় মাপের অভিনেত্রী। যার কাজের আন্তরিকতা ও নিয়মানুবর্তিতায় কোনও খাদ ছিল না। কাজের বাইরে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে ওই জগতের লোকের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখত না। এমনই ছিল তার ব্যক্তিত্ব যে কারও সাহসও হত না তা লঙ্ঘন করে।

স্বাভাবিকভাবেই তার অনেক শত্রু। সমালোচক থাকলেও, কেউ মুখ খুলত না। সাফল্যের হাত ধরে আসে শত্রু। তার চূড়াতে জীবন নিঃসঙ্গ। ঐশিকা এই নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে শুধু অস্মিতাকে নিয়ে। তার ভালোবাসা, তার পরিবার, তার বিশ্ব!

ঐশিকা ছোট্ট অস্মিতাকে কোলে তুলে নিয়ে চোখ মুছে দিয়ে বলল ‘‘জানি না মা। তুই আমার নিজের মেয়ে না। আমি তোকে একটা অরফ্যানেজ থেকে দত্তক নিয়েছি’’, বলে তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিল।

‘‘ওরা বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে কী বলব?’’

‘‘সত্যি কথা। বলবি তুই আমার পালিতা কন্যা। এতে তোর আমার জীবনে থাকা একটুও কমে না’’ চোখ বন্ধ করে বলল ‘‘তৎত্বম অসি’’

‘‘মানে?’’

‘‘তুই আমার অখণ্ড অংশ। আমার আত্মা, আমার ভালোবাসা, তোর জন্যই আমি বেঁচে। তুই আমার পৃথিবী। আমার শরীরের প্রতিটি কোষে তোর অস্তিত্ব। আমিই তোর বাবা, মা, তোর পৃথিবী’’ অস্মিতাকে আদর করতে করতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল ঐশিকা।

অস্মিতারও চোখে জলে। কান্নাভেজা গালে আদর করে জল মুছে দিয়ে ঐশিকা আচ্ছন্ন বসে ছিল। মোচড়ানো ব্যথার সঙ্গে চোখের জল মিশে সংযমের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। চেপে রাখা আবেগগুলো ছাড়া পেয়ে ঘূর্ণাবর্তে। তার মাতৃসত্তার কবচ জটায়ুর ডানা দিয়ে অস্মিতাকে জড়িয়ে সুরক্ষায়। অন্ধ আবেগে শুনতে পাচ্ছিল মায়ের ঘন ঘন নিশ্বাস। আরও জোরে দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছিল মাকে। বুঝতে পেরেছিল শান্তির খোঁজে মা একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। সে-ই ওই আশ্রয়! দুটি আত্মা জীবন সমুদ্রে ভাসছে তাদের নিজেদের অশ্রু সিঞ্চিত পূর্ণতার পথে। এই কঠোর বিশ্বে নতুন করে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়।

অস্মিতা বুঝতে পারল তার এই ভীতি, এই শূন্যতা মায়ের চলে যাওয়াতে। সেই ছেলেবেলার জগৎটা শেষ। এখন সে একদম একা... একাই জীবনের পথে হাঁটতে হবে।

দীপঙ্কর আঙ্কল রহস্যময়। বহুবার সে চেষ্টা করেছে এই মধ্যবয়স্ক মানুষটাকে বোঝার। ছোটবেলা থেকে মায়ের মৃত্যুর খবর অবধি। সে একই রকম অন্তর্মুখী। কিছুতেই তাকে বুঝে উঠতে পারেনি। ওর সঙ্গে মায়ের সম্পর্কটাও ধোঁয়াটে। অন্তরঙ্গতা, দরদ, বিনিময়ে কিছু না? যৌক্তিকতার বাইরে! শুধুই পারস্পরিক আস্থা? বিশ্বাস করা কঠিন। যদিও কোনও কারণ নেই।

মা যখন শুটিং থেকে ফিরতে দেরি করত আঙ্কল পড়া দেখাত।

‘‘অঙ্ক করার সময় মন দেওয়া দরকার। অন্য কথা চিন্তা করলে অঙ্ক হবে না’’ যদি সে স্বপ্নের রাজ্যে পাড়ি দিত, দীপঙ্করকাকু ঠিক তাকে ফিরিয়ে আনত।

ক্যালকুলাসের প্রবলেম সলভ্ করতে শিখেছিল কাকুর কাছে। জানে না, মা বাড়িতে থাকলেও কতটা হেল্প করতে পারত। মায়ের অনুপস্থিতি কাকুই পূরণ করে দিত। তার প্রয়োজন সব কাকুই সহানুভূতির সঙ্গে মেটাত। বছরগুলো পেরতে অস্মিতা কাঁচা-পাকা চুলের কাকুকে বেশ পছন্দ করতে

শুরু করল। তাও কিছু একটার অভাব ছিল। বুঝতে পারত না, কী! দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য দেওয়াল। সেটাই কাকুকে আলাদা করে রাখত। ছোঁয়া যেত না। এত কাছের হয়েও একটা এনিগমা। আজও...

অস্মিতা একটা সিগারেট ধরাল। তার ধোঁয়া মাঝরাতের মৃদুমন্দ বাতাসে। চাঁদ তার অমায়িক উজ্জ্বলতায় হাসিখুশি। সে একা। সব আশা, অনিশ্চয়তা সরিয়ে, নিজেকে সামলে একা চলার জন্য তৈরি। অতীতকে আর্কাইভে তুলে নতুন আলোয় দীক্ষিত হতে চায়। বিভিন্ন ইথেরিয়াল স্তর পার হয়ে পৌঁছে যেতে বদ্ধপরিকর নির্ধারিত ভাগ্যে। সে কাকু সঙ্গে থাকুক বা না থাকুক।

***

অবশেষে অগ্নিদেবের সময় হল হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজগুলো পড়ার। 'চলচ্চিত্র জগতের সম্রাজ্ঞী, ঐশিকা রায়ের অকালমৃত্যু হয়। কোনও এক অপরিচিত আততায়ী তার খুনের জন্য দায়ী। হরীশ মুখার্জি রোডের পৈতৃক বাড়ি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও এক প্রমোটারের মতবিরোধ ছিল। দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছয়। এই দ্বন্দ্বের একমাত্র সুরাহা ছিল ঐশিকার মৃত্যু। বিস্তারে জানতে হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

লোকটির নাম প্রাঞ্জল বাগচি। এ-ই ফোন করেছিল। খবরটা যদি ভাঁওতা হত, লোকটা নিজের পরিচয় দিত না। এই পরিস্থিতিতে লোকটার সাধুতা যাচাই করার আর কোনও উপায় না থাকায়, অগ্নিদেব ঠিক করল ওর সঙ্গে একবার কথা বলে নেবে। ঐশিকার অন্য দিকটাও জানা দরকার।

লাউঞ্জারে বসে, মোবাইলের কল রেকর্ডার অন করে ফোন "এসপি অগ্নিদেব চ্যাটার্জি"

"যাক, শেষ অবধি সময় হল ফোন করার" প্রাঞ্জল অপর প্রান্তে।

"আপনার নাম প্রাঞ্জল বাগচি। ঠিক বললাম?"

"হ্যাঁ"

"আপনি কে?"

"নাইটিঙ্গল এন্টারপ্রাইজের মিস্টার রাস্তগির প্রাইভেট সেক্রেটারি"

"নাইটিঙ্গল এন্টারপ্রাইজ?"

"ডেভেলপার, বিল্ডার, প্রমোটার ফার্ম। দক্ষিণ কলকাতায় অফিস"

"এই লকডাউনের সময় আমার পক্ষে অপনার অফিসে যাওয়া সম্ভব নয়, আর আপনিও আমার অফিসে আসতে পারবেন না। তাই যা বলার ফোনেই সারতে হবে"

"বুঝতে পারছি" প্রাঞ্জল ধীরভাবে উত্তর দিল।

"বেশি লোক তো ওনার মৃত্যুর খবর জানে না, আপনি কী করে জানলেন?"

"খবরটা রায়তি মিত্রর কাছ থেকে জেনেছি। আমার পাশের বাড়িতেই থাকে"

“এই রায়তি মিত্র কে?”

“ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কস্টিউম সেকশনে কাজ করে। যে যৎসামান্য ক’জন সৎকারে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে একজন”

যারা এসেছিল তাদের সকলের ডিটেলসই অগ্নিদেব নোট করে রেখেছে। যদিও দেখার সময় হয়নি। এই ফোনের পর দেখতে হবে রায়তি ওই তালিকায় আছে কি না। তার আগে প্রাঞ্জল যে খবর দেওয়ার কথা বলেছিল মেসেজে, তা জানতে হবে।

“ওই পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল তা নিয়ে বলুন”

প্রাঞ্জল গলা পরিষ্কার করে বলল “ঐশিকা ম্যাম হরীশ মুখার্জি রোডের পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তারকা হওয়ার আগে ওখানেই থাকতেন। পরে গল্ফ গ্রিনে চলে যান। প্রথমে ফ্ল্যাটে, পরে ওখানেই নিজের বাড়িতে। এই প্রপার্টিটা যেহেতু খুব ভালো জায়গায়, নাইটিঙ্গল এন্টারপ্রাইজের মালিক মিস্টার রাস্তগি এটা ডেভেলপ করতে চাইলেন, ফ্ল্যাট করে বিক্রির জন্য। অনেকবার ঐশিকা ম্যামকে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু বারবারই উনি অস্বীকার করেছেন”

“খুনের জন্য যথেষ্ট কারণ না” অগ্নিদেব আপত্তি জানাল।

“আসছি ওখানে। মিস্টার রাস্তগি ম্যামকে দুটো ফ্ল্যাটই শুধু অফার করেননি, সঙ্গে বেশ কিছু টাকা দিতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু ম্যাম তা রিফিউজ করেন। ওই প্রপার্টি ডেভেলপমেন্টের ৪০% শেয়ার চান”

“সেটা তাঁর ইচ্ছে। রাস্তগির যদি না পোষাত, ছেড়ে দিতে পারতেন”

“ওনার মতো লোকের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ওই এলাকার সবচেয়ে বড় প্রমোটার। গুন্ডা ছাড়াও ওনার অনেক পলিটিক্যাল যোগাযোগ। একবার যখন ওই প্রপার্টিতে চোখে লেগেছে তখন কেউ ওনাকে আটকাতে পারবে না। যদিও অনিচ্ছুকভাবে এই ডিলটাতে সাইন করেছিলেন, এ ব্যাপারে খুবই অখুশি ছিলেন। ঐশিকা ম্যাম ১ লাখ টাকাও দিয়েছিলেন আগাম হিসেবে, যখন ডিলটা সাইন হয়। পুরো কন্ট্রোল পেতে ঐশিকা ম্যামকে না সরিয়ে উপায় নেই”

“এই লকডাউনের সময়, এত নজরদারির পরও ওনার ফ্ল্যাটে ঢুকতে কোনও অসুবিধা হয়নি!”

“জানি না, উনি নিজে করেছেন না কি ওনার কোনও লোক। কে কীভাবে করেছে, সেটা খুঁজে বার করা আপনার দায়িত্ব”

অগ্নিদেবের জানা দরকার এই প্রাঞ্জল কেন ওর মালিকের বিরুদ্ধে এত কথা বলছে “আপনার বসের বিরুদ্ধে কথা বলে আপনার কী লাভ?”

“সারা জীবন সামান্য মাইনেতে কাজ করেছি। ঐশিকা ম্যাম আমার সঙ্গে একটা ডিল করেছিলেন, আমি যদি ওনাদের কনট্র্যাক্টটা কার্যকর করতে পারি, তাহলে উনি আমাকে ওনার অংশের ১০%

দেবেন। সেটা কত বড় অঙ্ক বুঝতে পারছেন’’

আর্থিক লোভে ক্ষোভ! যাচাই করতে হবে। উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বুঝল, প্রাঞ্জল এতখানি ক্ষতি হওয়াতে খেপে গেছে। প্রতিহিংসা বশত রাস্তগির শাস্তি চায়, যদি প্রমাণ করতে পারে। সে নিজেও অনেকবার এরকম ভেবেছে। সে-ও যদি সুযোগ পেত তাহলে লোধাশুলিতে বেইমানির বিরুদ্ধে শাস্তি দিত। ভাগ্যের জোরে পার পেয়ে গেছে। সারাজীবন বিষাদের মধ্যে কাটাতে হত না। যদি ফাঁসটা শক্ত করে না ধরতে পারে তাহলে রাস্তগিও অনায়াসেই বেরিয়ে যাবে। জানে না, এই বাড়তি কাজের চাপে, যথাযথ কাজ করে উঠতে পারবে কি না। এই স্বপ্ন দেখা লোকটার জন্য দরদ হল।

‘‘অনেক ধন্যবাদ এই খবরের জন্য। আবার কথা হবে, তদন্ত আরেকটু এগোলে’’ অগ্নিদেব লাইনটা কেটে দিল।

প্রাঞ্জল যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তার মানে ঐশিকার ফিল্ম ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে অর্থ রোজগারের চেষ্টা ছিল। তাহলে তো ওর অতীতটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখতে হয়। সৎকারে আসা লোকেদের লিস্টটা দেখেল। হ্যাঁ, রায়তি মিত্র সেদিন ছিল। হতে পারে সত্যি কথাই বলেছে লোকটা। কিন্তু এত সবের মধ্যে এক সামান্য কস্টিউম ডিজাইনার কেন ঐশিকার সৎকারে আসবে, সেটাই রহস্য। তার মানে সে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাই যদি হয়, তা হলে আরও কিছু জানা যাবে এই মহিলার সঙ্গে কথা বললে।

বেশ কিছু লোকই ছিল সেদিনের সৎকারে। তাদের বাইরেও একটা সূত্র দরকার। ওর কো-অপারেটিভের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে তেমন কিছুই এগোনো যায়নি। আন্দাজে এগোতে দ্বিধা।

এখন তার পক্ষে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা বা সিস্টেমেটিক্যালি এগনো খুবই অসুবিধা। বিশেষ করে যখন এই প্যানডেমিক মাথার ওপর নাচছে। তার চেয়ে সব থেকে ভালো হবে যদি সৌরিককে কাজটা দেওয়া যায়। ওর হাতে অঢেল সময় অ্যানালাইজ করার জন্য।

ফোনে জানাল, প্রাঞ্জল বলে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিল...

***

অগ্নিদেব আর প্রাঞ্জল বাগচির কথোপকথন শুনল সৌরিক।

‘‘আপনি কি সৎকারে আসা লোকের লিস্টটা পাঠিয়েছেন?’’ সৌরিক জিজ্ঞেস করল।

‘‘পাঠিয়েছি মনে হয়। তা-ও আরেকবার পাঠাচ্ছি। রায়তি তোমার সেরা বাজি। আচ্ছা, অস্মিতা যে নম্বর থেকে মেসেজ পেয়েছিল সেটা চেক করেছি। প্রিপেড নম্বর। আইডেন্টিটি ফেক। এখানে এরকম হাজার ফেক সিম্ কার্ড পাওয়া যায়। যদিও ওটার আইএমইআই নম্বরটাও ট্রেস করা গেল না।

‘‘ট্রেস করা গেল না মানে?’’

‘‘হয়ত ফোনটা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে’’

যাঃ! মন্দ কপাল! সৌরিকের কাছে কেউই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। সবাই তার শ্যেন নজরে, এমনকি দীপঙ্করকাকুও। সামাজিক চিত্রটা ব্যক্তিগত চিত্রের থেকে একদমই আলাদা। সত্যিটা পুরো জানতে হলে ওই ব্যক্তিগত দিক থেকে আরও খবর পেতে হবে।

কিন্তু শুরু করার আগে দুটো ব্যাপার দেখার আছে - সম্ভাব্য উদ্দেশ্য, আর আততায়ী কীভাবে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকল। মেন দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তার মানে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আততায়ী ঐশিকার পরিচিত বা আশা করছিল তাকে। ঘরে কোনও শারীরিক হাতাহাতির চিহ্ন ছিল না। খুনের অস্ত্র ইছাপুরের রাইফেল ফ্যাক্টরিতে তৈরি ৯ মিলিমিটার ১এ সেমি-অটোম্যাটিক পিস্তল। যা পুলিস, মিলিটারিতে হরদম ব্যবহৃত। যাদের প্রশ্ন করা হয়েছে তাদের কথাও তো জানতে হবে, অন্যান্য সোশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যাচাইয়ের জন্য। তাদের মুখগুলোও। মুখ মানুষের আত্মার প্রতিচ্ছবি।

ও ঠিক করে প্রথমে রায়তিকে ফোন করবে। ‘‘সৌরিক চ্যাটার্জি। আপনাকে ঐশিকা রায়ের সৎকারে দেখেছিলাম।’’ মিথ্যা বলল ‘‘এই ভোডাফোন লাইন আজকাল ঠিকমতো কাজ করছে না। ঘনঘন ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। স্কাইপ বা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও চ্যাট করতে পারি?’’

রায়তি একটু অবাকই হল এই অচেনা ব্যক্তির ফোন পেয়ে। কথা বলতে তো কোনও অসুবিধা নেই ‘‘হোয়াটসঅ্যাপ ঠিক আছে’’

সৌরিক লাইন কেটে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করল ‘‘সৌরিক, ঐশিকা রায়ের জামাই’’

অপর দিকে রায়তির মুখটা হোয়াটসঅ্যাপে। ডিম্বাকৃতি, সুন্দর দাঁতের সেটিং, এলোমেলো চুল, হাউসকোট পরা। সৌরিককে দেখল রায়তি। পাঞ্জাবি পরা। বেশ সুদর্শন। চশমাও পরে ‘‘আমার নাম্বর কোত্থেকে পেলেন?’’

‘‘অগ্নিদেব চ্যাটার্জি, বিধাননগর থানার এসপির থেকে। অস্মিতা আমার স্ত্রী। এই মর্মান্তিক অঘটনে আমরা বিস্মিত। আপনার ওনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল?’’

‘‘আপনার কথা ওনার কাছে শুনেছি। হ্যাঁ, আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। উনি আমাকে অসুবিধার সময় খুব সাহায্য করেছেন’’

‘‘আপনিও ফিল্ম জগতের লোক?’’

‘‘ঠিক তা নয়। স্টিচক্রাফট্ নামে একটা কসটিউম ডিজাইনিং ফার্মের সঙ্গে কাজ করি। টলিউডে আমরা ডিজাইনার জামা কাপড় সাপ্লাই করি। ঐশিকা ম্যামও আমাদের থেকে অনেক জামাকাপড় কিনতেন। ওনার বাড়িতেও গেছি অনেকবার, ডেলিভারি করতে বা মাপ নিতে। সে ভাবেই ঘনিষ্ঠতা।’’

‘‘আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের কোনও দিন দেখা হয়নি। ভাগ্যের ব্যাপার... যখন আমরা গেছি, তখন আপনি ছিলেন না’’

“অস্মিতা ম্যামকে কয়েকবার দেখেছি। ওনার জন্যও কয়েকবার ড্রেস বানিয়ে দিয়েছি। ওনার নিশ্চয়ই মনে আছে।”

“আমি চেক করে নেব ওনার সঙ্গে। আপনি জানেন নিশ্চয়ই ঐশিকা দেবীর মৃত্যুটা। নিজের ফ্ল্যাটেই খুন”

“হ্যাঁ, সেরকমই শুনেছি” কান্নায় ভেঙে পড়ল রায়তি “কে এমন কাজ করতে পারে অমন এক দয়াময়ীর সঙ্গে!”

“বোধহয় ওনাকে খুব ভালবাসতেন।”

“সময়ের সঙ্গে উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতে শুরু করেন। বাবার অসুখের সময় থেকেই। বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল হার্ট অ্যাটাকের সময়। তখন স্টেন্ট-এর প্রয়োজন। ওটা তো খুব দামি। বাবার কোনও ইনসিওরেন্স ছিল না। আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবার। তখন পাগলের মতো অর্থ সাহায্য খুঁজছি। ম্যাম হাসপাতালের বিল মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আজ বাবা বেঁচে আছেন ওনার জন্যই” রায়তির চোখ ভিজে।

“সরি, আপনাকে বিব্রত করতে চাইনি।”

“না, আপনার দোষ নয়। এই শো-বিজের জগতে সকলেই নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত। কেউই এক পয়সা দেবে না আমাদের মতো অভাগাদের জন্য। ম্যাম ব্যতিক্রম। ওনার কাছে খুবই ঋণী”

সৌরিক মাপছে রায়তিকে। ঐশিকার ওপর খুব মায়া এই মেয়েটির। এই মেয়েকে এনক্যাশ করেলে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু একবারে না। তাহলে সন্দেহে চুপ করে যেতে পারে। বরং ধীরে এগনো ভালো। সাধারণ লোকেদের তদন্তের ব্যাপারে অস্বস্তি থাকে।

“আমরা দুজনেই দিশেহারা। ভাবতেই পারছি না কেউ ওকে খুন করতে পারে! অস্মিতা এখন একা দিল্লিতে। খবরটা পেয়েই দুঃখে ভেঙে পড়েছে”

“আমাদেরও একই অবস্থা। আমার তো শিরদাঁড়াই ভেঙে গেছে। এখন দরকার হলে এমন কেউ নেই যার কাছে চাইতে পারব”

“কোনও আইডিয়া আছে, এমন কাজ কে করতে পারে?”

“বুঝতে পারছি না। ওনাকে যতটুকু দেখেছি উনি ইন্ডাস্ট্রিতে একদম প্রফেশনাল ছিলেন। কাজেই শুধু মন। কারও সঙ্গে কাজের বাইরে বিশেষ মিশতেনই না”

“আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?”

“না। প্রাঞ্জলদা কিছু বললেও বলতে পারে”

“কে প্রাঞ্জল?”

‘‘প্রাঞ্জল বাগচি, আমার প্রতিবেশী। ওনার ফার্মের সঙ্গে ঐশিকা ম্যামের কিছু কাজের কথাবার্তা চলছিল’’

‘‘ওনার নম্বর আছে?’’

‘‘হ্যাঁ। আপনাকে টেক্সট করে দিচ্ছি ওনার ডিটেলস’’

‘‘ধন্যবাদ। আমি কি আপনার নাম করতে পারি, ওনার সঙ্গে কথা বলার সময়?’’

‘‘নিশ্চয়ই’’

‘‘ঠিক আছে। ভালো থাকবেন। সাবধানে থাকবেন। আমার নম্বরটা সেভ করে রাখুন। যদি কোনও খবর দিতে হয় যোগাযোগ করবেন’’

‘‘আপনিও সাবধানে থাকবেন। অস্মিতা ম্যামকে আমার সমবেদনা জানাবেন।’’

‘‘হ্যাঁ, জানাব।’’

সৌরিক লাইনটা কেটে দিল। দু-মিনিট পর প্রাঞ্জল বাগচির ভি-কার্ড পেল। ভিডিও চ্যাটের সময় রায়তির একটা স্ক্রিনশটও নিয়ে রেখেছিল। প্রাঞ্জলকে ফোন করার আগে ঠিক করল একবার রায়তির সোশাল নেটওয়ার্ক চেক করে নেবে। ওখানে ও কীভাবে নিজেকে দেখাচ্ছে। সেটা ওর আসল ছবি না-ও হতে পারে।

সৌরিক দেখল রায়তির একটা টুইটার অ্যাকাউন্ট আছে, কিন্তু তাতে কোনও পোস্টই নেই। ও কাউকে ফলো করছে না। কেউ ওকেও ফলো করছে না। তার মানে টুইটার অ্যাকাউন্ট খুললেও সেখানে সে মোটেই অ্যাকটিভ নয়। ফেসবুকে খুঁজতে গিয়ে তিন জন রায়তি মিত্রকে পাওয়া গেল। যে প্রোফাইলটা ওই ছবির সঙ্গে ম্যাচ করে সৌরিক সেটাই খুলল।

হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো ছবির থেকে এই প্রোফাইলের ছবিটা অনেক বেশি চটকদার। সুন্দরী না হলেও একটু মেক আপে সাদামাটা বাঙালি মেয়েটিকে নেহাত মন্দ লাগছে না। ওর প্রোফাইল দেখছিল। পড়াশোনা, আত্মীয় বা কাজের কোনও উল্লেখ নেই। রিলেশনশিপে দেখাচ্ছে ‘কম্প্লিকেটেড’ মানে কোনও পুরুষের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ আছে। স্বামী না বয়ফ্রেন্ড বোঝা গেল না। দারুণ সব ডিজাইনার ড্রেসে অনেকগুলো ছবি। কাজের ব্যাপারে কিছুই লেখেনি। ওর প্রিয় পঙক্তিঃ

‘বেচে কে, কেনে কে?

স্বপ্নটা কার?

ফিরিওয়ালা ঘুরে মরে মন ছারখার’

শেষের লাইনে লেখা ‘আমরা সকলেই স্বপ্নের ব্যাপারি’

একগুচ্ছ ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডস। কেউ তাদের রোজনামচা পোস্ট করছে, কেউ তাদের মিডিয়া হাইপ। একটা কথা পরিষ্কার, সকলেই কিছু না কিছু পরিচয় সঙ্কট বা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাদের

শূন্যতাকে পরিতৃপ্ত করার নিদারুণ আকুতি। রায়তি কিন্তু সম্পূর্ণতা আর শূন্যতার মধ্যে নেই। নিজেকে প্রচার করতে উদ্যোগীও নয়। যদিও তার পোশাক সূক্ষ্ম ভাবে প্রলুব্ধকর।

ইনস্টাগ্রামে তার আরেক রূপ। সেখানে তার ইরোটিক ভাব, লোভ-দেখানো ভঙ্গিমা। হোয়াটসঅ্যাপে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, ফেসবুকে স্টাইলিস, ইনস্টাগ্রামে কামাতুর নারী। অবাক, এই তিন রূপ প্রকাশে! এ কী দিবাস্বপ্ন? না কি নিজের আসল চেহারাটা লুকোতে চাইছে এই অপার্থিব শো-বিজ দুনিয়াতে? প্রাঞ্জলকে ফোন করার আগে এই মেয়েটিকে একটু বুঝতে হবে।

সৌরিক মেয়েটির একটা পার্থিব ছবি তৈরি করার চেষ্টা করল। তুলির টানে, রঙের সমারোহে। যুক্তিসিদ্ধ ভাবে কোনও নারীর মনের ছবি আঁকা যায় না, বাস্তবের ক্যানভাস ছাড়া। একটা দ্বৈত বেগের দোলাচলের দ্রুত গ্রাস। যুক্তির শেষ সীমা থেকে দেহী আকর্ষণে। দুই মেরুতে খেলে বেড়াচ্ছে। ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে যুগ্ম টালমাটালের কিনারার।

রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা, না কি নিজেকে জাহির করা?

চাপা বাসনা, না কি চাদরের আড়ালে গণিকা?

জানে না, কিন্তু ডেফিনিটলি আরও জানতে হবে। বিশেষ করে প্রাঞ্জলকে ওর রেফারেন্স নিয়ে কথা বলার আগে।

***

আর কী সে সব দিন আছে!

অগ্নিদেব যখন ছোট ছিল, ওরা ২৩ পল্লী দুর্গা মন্দিরের কাছে যতীন দাস পার্কে পটুয়াপাড়ায় থাকত। বাড়ির কাছে সেন্ট হেলেনস্ স্কুলে দু-ভাই পড়ত। বাবা তীব্র বামপন্থী মনোভাবাপন্ন স্কুলশিক্ষক। নিজের চিন্তাধারায় দু-ছেলেকেই অভিষিক্ত করেছিলেন। যদিও কেউই অ্যাকটিভ পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। পড়াশোনা ছাড়া ওদের সমবয়সি আর দশটা ছেলের মতোই পাড়ায় মেয়ে দেখতে পছন্দ করত। টাইট ফ্রক পড়া মেয়ে দেখলে দু-একটা ক্যাট কল ছোড়া, গোগ্রাসে চোখ দিয়ে গেলা। এমনই জীবন ছিল।

ফুচুও কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। দু-ভাই পার্কে ঘুরে বেরাবার সময় ফুচু যখন পাশ দিয়ে যেত, ওর সদ্য পূর্ণতায় ভরা বেড়ে ওঠা বুক, নিতম্বের ঝলকানি দেখেই অগ্নিদেব গেয়ে উঠত *‘একেলে একেলে কাহাঁ যা রহে হো...’* ফুচু কোনও দিন ফিরেও তাকায়নি। যদিও আত্মতৃপ্তির হাসিটাও অগ্নিদেবের চোখ এড়ায়নি। জানত ঈশ্বরের বরপ্রাপ্ত ও। যেমন রূপ তেমন শরীরের গঠন। আকর্ষণ ক্ষমতা অপার। ওদের অগ্রাহ্য করে বাড়ি চলে যেত ফুচু। রাতে ঘুম নেই। উঠতি যৌবনের শারীরিক চাহিদা তাড়িয়ে বেড়ায়। গোঁড়া পরিবারের মেয়ে। সাহস ছিল না কোনও ছেলের দিকে তাকায়।

বেলতলা গার্লস স্কুলের ক্লাসে সবার আগে কুমারীত্ব লাভ করে। জানত ঈশ্বর তাকে দু-হাত উজাড় করে দিয়েছে। ওরা তারিফ করলে মনে মনে ভালোই লাগে।

নকশালবাড়ি আন্দোলন ঘাটি গাড়তেই বাবার চিন্তাধারায় দীক্ষিত দুই ছেলে মেতে উঠল সেই নতুন প্রগতিশীল ভাবধারায়। বামপন্থীদের মিটিংয়ে যেতে শুরু করল। যদিও অ্যাকটিভ ছিল না।

দাদা ঋদ্ধদেব স্কুল পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে। জড়িয়ে পড়ল অ্যাকটিভ নকশাল মুভমেন্টে। ইউনিয়ন লিডার হওয়ার দৌলতে জ্বালাময় বক্তৃতা দিত এই পচা সিস্টেমের বিরুদ্ধে। প্রথমে কলেজে। তারপর আরও বড় পর্যায়। ততদিনে ত্রিবেণী কানু, শোভম আলি, গোর্খা মাঝি, তিলক মাঝির মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গল সাঁওতাল ধৃত। চারু মজুমদার গা-ঢাকা দিয়েছেন। ঋদ্ধদেব ওদের যুব ব্রিগেড পরিচালনা করত। কৃষকদের সংগঠন তখন নকশালবাড়ি, খয়েরবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এলাকা কব্জা করে নিয়েছে। জোতদারদের কাছ থেকে জমি, শস্য, আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিচ্ছে। দার্জিলিঙের চা বাগানের কর্মীরা ধর্মঘটে যোগ দিয়ে তাদের সমর্থন জানাচ্ছে।

ঋদ্ধদেব কলেজ পাস করে ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্যাল সায়েন্সে স্নাতকোত্তর কোর্সে। ও কৃষকদের সংগঠনের সঙ্গে বেশি যুক্ত ছিল। ক্রমে নকশাল আন্দোলনে যত জড়িয়ে পড়তে লাগল, কলেজের অ্যাটেনডেন্স তত কমতে লাগল। সে তখন পুরোপুরি নিয়োজিত সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে।

ক'বছর বাদে ছোট ভাই অগ্নিদেব একই কলেজে। ঋদ্ধদেব যুব নেতৃত্ব তার হাতে তুলে দিল। সুদর্শন, মেধাবী ছেলে যুব সংগঠনের নেতৃত্বে, অরুণিমা তো ধরাশায়ী! প্রথম সাক্ষাৎ যখন সে অষ্টাদশী। কলেজে প্রথম পদার্পণ।

সেবার কলেজ ফেস্টে অরুণিমার অপূর্ব রবীন্দ্রসংগীত শোনার পর স্টেজে উঠে অগ্নিদেব ‘‘ব্রিলিয়্যান্ট!’’

‘‘ধন্যবাদ’’ সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে অরুণিমার জবাব। আবার উপেক্ষা! বন্ধুদের সঙ্গে অডিয়েন্সের মাঝ থেকে শুনছিল স্টেজে মোটা গলায় অগ্নিদেবের অসাধারণ গান। ঠিক যেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়!

প্রথমে একটু দ্বিধা, পরে জানতে পারে ইকোনমিক্সের মেধাবী ছাত্র। ব্যাস, প্রেমে পড়ে গেল অরুণিমা। একদিন বাসের সিটে বসে দেখছিল পাশের মিছিলে সিস্টেমের বিরুদ্ধে কটাক্ষ। ঘার ঘোরাতেই, পাশে বসে অগ্নিদেব!

‘‘আমাকে এড়িয়ে যাও কেন?’’ প্রশ্ন ছুড়ল।

‘‘আপনাকে চিনি না’’

‘‘আমরা একসঙ্গে পড়ি’’

‘‘না, পড়ি না। আমার ফিলজফি ডিপার্টমেন্টে কোনও দিন আপনাকে দেখিনি’’

‘‘একই কলেজ তো’’ অগ্নিদেব কথা চালিয়ে যেতে চায়। ‘‘এক কাপ চা চলবে?’’

অরুণিমা রাজি। আনন্দ ধরে না অগ্নিদেবের। দু-জনেরই প্রেম উথলে উঠছে। ওর কুমারীত্বে পুরুষ স্পর্শের জন্য আকুল প্রার্থনা।

কফি হাউসে অগ্নিদেব জিজ্ঞেস করল ‘‘কামু পড়েছ?’’

‘‘না’’

‘‘কাফকা?’’

‘‘না’’

‘‘রবি ঠাকুর?’’

হেসে ফেলল অরুণিমা। কোন বাঙালি রবি ঠাকুর পড়েনি! ও হয়ত বিদেশি লেখকদের লেখা পড়েনি, কিন্তু নিজের ঐতিহ্য জানবে না? অগ্নিদেব ওর সঙ্গে খুনসুটি করছে।

পাল্টা নিতে হেসে জিজ্ঞেস করল, ‘‘সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি?’’

চুপ করে গেল অগ্নিদেব। বগলে চে গুয়েভেরার বই, মুখে চারমস্ সিগারেট। সে আ

মলের টিপিক্যাল বুদ্ধিজীবী। দুটি প্রেমের পাখি উড়ে বেড়াতে লাগল কলকাতার আকাশে বাতাসে নিবিড় আলিঙ্গনে, চুম্বনে। কালে, এই প্রেম রূপ নিল কাম লিপ্সায়। যা লোধাশুলি যাওয়ার আগের দিন চরম পর্যায়।

রিটায়ারমেন্টের আর এক বছর বাকি। স্মৃতি রোমন্থন করছে দাদার সঙ্গে দিনগুলোর। যদিও দাদা ক’বছরের বড়, তা-ও মনে প্রাণে ওরা বন্ধু। চারু মজুদারের চার্টার অনুযায়ী চৌখস অসীম (কাকা) চ্যাটার্জিকে অনুসরণ করে যখন নকশালদের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বিতাড়ন করা হল উত্তরাধিকার সূত্রে বামপন্থী আদর্শ রক্তে। সরে এসেছে মূল ধারা থেকে।

ঋদ্ধদেব শুধুই বড় দাদা ছিল না। ,ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। ঋদ্ধদেব যেমন সাহসী, অগ্নিদেব তেমনই ভীরু। স্বতন্ত্র কিন্তু দৃঢ়। এক ভাই অন্যের পরিপূরক। এই অপূরণীয় শূন্যতা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

সেদিন যদি ঋদ্ধদেবকে পেছন থেকে গুলি করে খুন করা না হত, যা ওকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল, তা হলে সেদিন পুলিশ ওকেও ধরতে পারত না। কিন্তু হায়! ভাগ্যের ইচ্ছে ভিন্ন। জেলের কালকুঠরিতে পাশবিক অত্যাচার বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাকেই মেরে ফেলেছিল। তার সঙ্গে দাদার মৃত্যুশোক। সব মিলিয়ে জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে পৌঁছে গেছিল। তার মধ্যে থেকেই জন্ম ওই মানুষটার প্রতি তীব্র ক্ষোভ আর ক্রোধ। যার জন্য তার এত কষ্ট।

কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর জেল থেকে ছাড়া পেল। বেরিয়ে দেখে মা-বাবা দুজনেই গত। দুই ছেলের এমন পরিণামে ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। সে যখন শুনল, অরুণিমা বিয়ে করে

বিদেশে চলে গেছে, তখন নিজেও মনে-প্রাণে ভেঙে পড়ল। আদর্শ গুলিয়ে দেশোদ্ধারের স্লোগান তখন ডকে। মা বাবা মৃত। অরুণিমা হারিয়ে গেছে। দেশের সংগ্রাম ভুলে সেই ডুবন্ত সময়ে ভস্ম থেকে উঠে দাঁড়ানোর আপ্রাণ সংগ্রাম। জীবন যদি এতটাই ভঙ্গুর, পাগলামির মধ্যে নড়বড়ে, তবে কেনই বা বাঁচার চেষ্টা? জীবন কী কঠোর ভাবে সবকিছু এলোমেলো করে দিল। নির্মম নম্রতার জন্ম আন্দোলনের অবক্ষয়ে। উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গকে দমিয়ে দিতে অপারেশন স্টিপলচেজই কাফি। আগুনটা নিভে গেলেও, অন্তরের আলোড়নে জর্জরিত।

চেতনায়, অর্থপূর্ণ অস্তিত্বে ক্ষুরধার আঘাত।

***

রোজকার টেলিভিশনে করোনা আপডেটস দেখতে দেখতে অস্মিতা আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করে রেজিস্টার করছিল, এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠল। অন্য প্রান্তে সৌরিক ''ব্যস্ত?''

''কোথায় ব্যাস্ত? আরোগ্য সেতুতে রেজিস্টার করছিলাম''

''সেটা কী?''

''নতুন অ্যাপ, যেটা করোনা স্ট্যাটিস্টিক্স দেয়''

''ফোন করলাম অখিলেশ সোনির ব্যাপারে ডিটেলস জানতে'' অস্মিতাকে চুপ দেখে সৌরিক জিজ্ঞেস করল, ''এমন কিছু আছে যা তুমি আমাকে বলনি?''

অস্মিতা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বুঝল, সৌরিককে পুরোটা বলতে হবে। না হলে সম্পর্ক চোট খাবে। ইচ্ছে করেই চেপেছিল। অতীতকে টেনে তুলতে চায়নি। কিন্তু এসব গেরো থেকে দূরে থাকতে হবে। তাই ঠিক করল সৌরিকের ডিরেক্ট প্রশ্নের উত্তরে সত্যি বলবে।

''ও সহজ লোক নয়'' মিনমিন করে বলল।

''তার মানে?''

''সে আরেক গল্প। ঠিক কাস্টিং কাউচের মতো না হলেও, সেরকমই। এসব প্রোডিউসররা ছোট বা বড় যাই হোক মেয়ে দেখলেই চেখে দেখতে চায়। সোনিও তাই। আমাদের বিয়ের আগে''

''তুমি তো কখনও বলনি! তুমি শিকার? তুমি কী কখনও সিনেমায় নামতে চেয়েছিলে?''

''ঠিক তার উল্টো। আমি চাইনি। সোনি চেয়েছিল আমাকে নামাতে। মাকে বলেছিল আমাকে ওর কাছে পাঠাতে। মা ভীষণ রেগে সোজা না বলে দিয়েছিল। তারপর ওদের দু-জনের মধ্যে বড় ধরনের ঝামেলা হয়। এরই মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়। জানি না ওদের মধ্যে আর কী হয়েছিল। মা কোনও দিন বলেনি আমাকে। আমিও কোনও উৎসাহ দেখাইনি।''

''তাও তো দেখছি ও ৫ লাখ দিয়েছে''

‘‘তা তো কিছু জানি না। তুমি যখন লাস্ট বার বলেছিলে তখন মনে হয়েছিল ওটা কোনও ফিল্মের কনট্র্যাক্ট বা ওয়েব সিরিজের আডভান্স’’

‘‘অন্য কিছুর জন্যও হতে পারে...’’

‘‘আমার পক্ষে বলা মুশকিল’’

কিছু গন্ডগোল আছে যা পরিষ্কার করা দরকার। যত ঐশিকার মৃত্যু রহস্য সমাধান করতে যাচ্ছে তত নতুন তথ্য সামনে আসছে। প্রিয় ঐশিকা ম্যামের জীবনে অন্য দিকও ছিল। যা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যেটুকু জানতে পারা যাচ্ছে তার থেকে খুনের উদ্দেশ্যটা বার করতে হবে। রিয়্যালি হারকিউলিয়ান টাস্ক! হাতে যেহেতু যথেষ্ট সময়, মাথা খাটিয়ে সবচেয়ে লজিকাল সলিউশন বার করতে হবে।

তার একটা সুপ্ত গোপন কাজের জন্ম এই মহামারীর মাঝখানে।

চামুণ্ডেশ্বরীর অখিলেশ সোনির ব্যাপারে জানার জন্য আর কথা বাড়াল না। ফোনটা ছেড়ে দিল সৌরিক। কর্পোরেট ওয়েবসাইট থেকে ওর ফোন নম্বর বার করতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। বেশ বেলা হয়েছে। সৌরিক ঠিক করল হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলই করবে । স্ক্রিনশট নিলেই ওর ফটো সেভ করতে পারবে ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য। তার ওপর এখন ভোডাফোনের সার্ভিসের যা দুরবস্থা, পঞ্চাশ বার লাইন কেটে যায় কথা বলতে গেলে!

‘‘কে?’’ অখিলেশ অবাক।

‘‘স্যার, সৌরিক চ্যাটার্জি, ঐশিকা রায়ের জামাই। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনি নিশ্চয়ই জানেন মা ক’দিন আগে খুন হয়েছেন’’

‘‘হ্যাঁ, সেরকমই শুনেছি। খুবই দুঃখজনক। লকডাউনের জন্য ওনার শেষকৃত্যেও যেতে পারিনি। আমরা কন্টেনমেন্ট জোনে। বেরনো বন্ধ। অস্মিতা কেমন আছে?’’

‘‘অস্মিতাও আসতে পারেনি, আমিই ওনার শেষকৃত্য করলাম। অস্মিতা দিল্লিতেই শ্রাদ্ধ করল অনেক কষ্টে এক পুরোহিতকে ডেকে’’

‘‘তাই? ইশ্ খুব খারাপ লাগছে’’ অখিলেশের উত্তর শোকপূর্ণ স্বরে।

‘‘নিশ্চয়ই শুনেছেন ওকে খুন করা হয়েছে। ভাবছিলাম এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন কী? আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল, আপনি কিছুদিন আগে ওনার অ্যাকাউন্টে ৫ লাখ ট্রান্সফার করেছেন’’

‘‘হ্যাঁ, আমার একটা নতুন ওয়েব সিরিজের জন্য ওর সঙ্গে কনট্র্যাক্ট সাইন করেছিলাম। এখন ওই টাকাটা জলে গেল!’’

‘‘একদম চিন্তা করবেন না। ওই টাকা আমরা ফেরত দিয়ে দেব’’

অখিলেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যাক কেউ তো ওর দিক থেকে যোগাযোগ করল টাকাটা ফেরত দেবে বলে। ওঁর মৃত্যুর পর তো ভেবেছিল ওই টাকা আর কোনও দিন উদ্ধার হবে না। যদিও ওর কাছে যৎসমান্য। কিন্তু এক ব্যবসায়ীর কাছে প্রতিটি টাকার মূল্য আছে। এখন আশ্বস্ত হয়ে অনেক হালকা লাগছে। আলপচারিতায় যে কথা শুরু, সৌরিক তাতে মশলা ঢেলেছে। ওকে খুশি রাখতে পারলে টাকাটা পাওয়ার যোগ আছে।

''আমি কী ভাবে সাহায্য করতে পারি? একজন বিশিষ্ট সিনিয়র প্রভাবশালী তারকা হিসেবে আমাদের বহু দিনের সম্পর্ক। ডেডিকেটেড, সিনসিয়র, ওবলাইজিং। আর কী বলব।''

''ভাবছিলাম যদি আপনি কোনও সূত্র দিতে পারেন কে হতে পারে আততায়ী?''

পনেরো সেকেন্ডের নীরবতা। যেন ছেঁকে নিচ্ছে উপযুক্ত উত্তর ''বলা মুশকিল। তবে যদি টলি ওয়ার্ল্ড ভাবেন, তো 'না'। বয়সকালে সম্রাজ্ঞী ছিলেন। এখনও বাজারে সৌমিত্রবাবুর মতোই ডিমান্ড। পারসন্যাল লাইফ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। স্বভাবত উনি অন্তর্মুখী।''

''অস্মিতাকে চেনেন?''

''কয়েকবার দেখেছি। ভালো মেয়ে''

সৌরিকের ইচ্ছে ছিল অখিলেশের সঙ্গে আড্ডার ছলে অস্মিতা যা বলেছিল তা যাচাই করে নেবে। কিন্তু অখিলেশ বেশ বুদ্ধিমান, ওই পনেরো সেকেন্ডে নিজের গল্প ফেঁদে ফেলেছে।

''কোনও কথাবার্তা হয়নি?''

''ওর মায়ের মাধ্যমেই যেটুকু। এখন রাখতে হবে। পেমেন্ট, শুটিং ডেট নিয়ে অনেক ফোন বাকি। ভালো লাগল কথা বলে। দরকার হলে ফোন করবেন''

অখিলেশ লাইন কেটে দিল। লাউঞ্জারে বসে সৌরিক চিন্তা করছে, অস্মিতা আর ওর মধ্যে সুপ্ত সূত্রটা এখনও অস্পষ্ট। ঐশিকাই ভালো বোঝাতে পারত, কিন্তু এখন সে নেই। ওটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অখিলেশকে সন্দেহের তালিকায় নেওয়া যাবে না। ঘরে বসে এত খোঁজা চাট্টিখানি কথা না! মনে করার চেষ্টা করল গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের কেউ চেনা আছে কি না। নাঃ, কারও কথা মনে পড়ছে না। দেখা যাক। লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে কোনও সূত্র ঠিক পাওয়া যাবে।

একদিনের জন্য যথেষ্ট। এখন টেলিভিশনে করোনার গল্প। টেলিভিশন চালিয়ে দিল ।

***

বাবা সুবর্ণ চ্যাটার্জির মৃত্যুর পর যদিও সৌরিক বাবার তৈরি কোম্পানি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল, কিন্তু তাতে নিজে একটা নতুন মাত্রা এনেছে। সমান্তরালে তারও একটা নতুন ফার্ম শুরু করে দেয়। সুবর্ণ চ্যাটার্জি নিজের কোম্পানি বাড়াবার অনেক চেষ্টা করে। তবে তা বেশিরভাগই ক্ষমতায় থাকা কোনও রাজনৈতিক দলকে খুশি করে। কোনও রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে নয়। আর সব

ব্যবসায়ীদের মতোই সুযোগ সন্ধানী। ছেলে সৌরিক খড়গপুর আইআইটির ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রথম চাকরি ফিলিপসে। গোড়ার দিকে ব্যাটারি ও ইনভার্টার ডিভিশনে, পরে কম্পিউটার অ্যাক্সেসরিজ আর ডেটা স্টোরেজে।

গলসির কাছে গাড়ি দুর্ঘটনায় বাবার অকালমৃত্যুর পর সৌরিক বাবার কোম্পানির হাল ধরে। সঙ্গে শুরু করল নিজের সফ্‌টওয়ার প্রোগ্রামিংয়ের কোম্পানি ইউনিভার্সাল ইউনিটেক। ধীরে ধীরে নানা দেশি-বিদেশি সংস্থার একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সক্ষম হল যারা ওর কোম্পানিতে কাজ আউটসোর্স করবে। জুন রুফ, ইকো রাইট আর ট্রুলি ম্যাডলির মতো স্টার্ট আপ কোম্পানির 'গো-গ্রিন' পরিবেশ বান্ধব ড্রাইভের সঙ্গে যুক্ত হল ইউনিভার্সাল ইউনিটেক।

নিজের যোগ্যতায় এক উদীয়মান উদ্যোগপতি। এখন বিশ্বজোড়া প্যানডেমিকের জন্য কোয়ারান্টিনে আটকা পড়েলও অনেকদিন থেকেই সৌরিক দেখতে পাচ্ছিল এই অনিবার্যতা। প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিজস্ব দিশা আছে। সৌরিক জানে বৈষয়িক শক্তির একটা ডায়নামিক ভারসাম্য আছে। সেটা নড়ে গেলেই প্রকৃতি তাকে পরিত্রাণে তৎপর হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। অথচ চাহিদা তুঙ্গে। এই অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে হয় বিকল্প শক্তির উৎস খুঁজে পেতে হবে, না-হয় চাহিদা কমাতে হবে। এখনও বিকল্প শক্তির উৎস যেহেতু নেই, তাই চাহিদা কমানোই প্রকৃতির ধর্ম। প্রকৃতি সেটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ নয়তো মহামারি দিয়ে করে। এখন তার ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে উদ্যত। এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল এক পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পৃথিবী। গ্লোবাল শিফট। এর থেকে জন্ম নেবে এক দূষণমুক্ত পরিবেশে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার শক্তির নতুন উৎস। ঐশিকার মৃত্যুর আগে অবধি সৌরিকের চিন্তা ছিল নিজের কোম্পানি নিয়ে। এই অতিমারী ও গ্লোবাল শিফ্‌টের পর কী করে লাভ বার করবে।

লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসনের বিখ্যাত 'মর্টেড ডি'আর্থার' কবিতায় সঠিক লিখেছিলেনঃ

'পুরানো নিয়ম ভাঙবে, জায়গা হবে নতুনের,
ঈশ্বর পরিপূর্ণ করেন নিজেকে অনেক উপায়ে
যদি বা কখনও কোনও ভালো প্রথা দূষিত করে
এই বিশ্বকে'

বর্তমান বিশ্বব্যাপী যে পরিমাণ দূষণ তাতে 'ভালো প্রথা'র নতুন সংজ্ঞা দরকার। বাইবেলের পুরাকথায় ডেমিয়েন এই একবিংশ শতাব্দীর পরিত্রাতা হতে পারে। পৃথিবী এখন এই নতুন ডেমিয়েনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ৬৬৬ ও নতুন রূপ নিচ্ছে ইন্টারনেটে। এই মাহামারীতে নেটের ব্যবহারিক উপযোগিতা অনেক মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছে। সূক্ষ্মভাবে মানুষকে ঠেলে নিয়ে গেছে ডিজিট্যাল জগতে।

এই মৃত্যুর তদন্তের আগে অবধি সৌরিকের এমন আরও অনেক উৎপাদনশীল চিন্তা ছিল। লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রে এই তদন্তের দায় এড়ানো গেল না। এই উর্বর মস্তিস্ক যা কিনা অন্য ফলপ্রদ কাজে নিযুক্ত থাকতে পারত তা এখন এই আতঙ্কজনক পরিবেশের মধ্যে ভয়াবহ অপরাধের পর্দা উন্মোচনে সংযত। বর্তমান অবস্থায় বাধ্য হয়েছে ফোকাস পাল্টাতে।

কাজ বাদে ফিলিপসে তার নজরে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মৌনিষা। ফর্সা, কেতাদুরস্ত, স্পষ্টবক্তা মৌনিষা একই ডিভিশনে ওর কলিগ। মনিটরে কাজ করতে করতে মৌনিষা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত ওর পেছনে বসে কর্মরত সৌরিকের মেধাদীপ্ত মুখের প্রতিবিম্বে "পিক্সেলগুলো কোনায় ঠিকমতো আসছে না। তোমার কী মনে হয়?" সুন্দরী মৌনিষা সৌরিকের কিউবিক্যালে চলে আসত মতামত নিতে।

"চল দেখি" বলে সৌরিক ওর কিউবিক্যালে গিয়ে মনিটরের সামনে। মনিটর চেক করার সময়, মৌনিষা ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে মনিটরে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে ওর বুকের ঘষা।

মনিটরের কোনার দিকে লেখাগুলো দেখিয়ে বলত, "এখানের কোনাগুলোর ডেনসিটি কম না?"

সৌরিক সমস্যায় মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করত "হ্যাঁ, ঠিক। এই আল্ট্রাক্লিয়ার 4K UHD ইংল্যান্ড থেকে এসেছে না?"

"হ্যাঁ"

ঘাড়ের ওপর ওর স্তনের নরম স্পর্শ উপেক্ষা করে বলত "ওদের সমস্যার কথাটা লিখে জানাও"

নিজের কিউবিক্যালে ফিরে আসল সৌরিক। প্রায়শই লাঞ্চে সৌরিকের সঙ্গে আড্ডা মারতে চলে আসত "তুমি বেশি সিরিয়াস। জান তো *'অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে মেকস জ্যাক অ্য ডাল বয়!'*"

"জন্ম থেকে বোকা। নো প্লে মাথার ঘিলু উদ্দীপিত করবে" হেসে জবাব দিত সৌরিক।

"নিশ্চয়ই। শুধু একটু পলিশ দরকার" কলার দিইয়ের শেষ অংশটুকু শেষ করল মৌনিষা।

ক্রমে এই আড্ডা বিকেলে মিলেনিয়াম পার্কে। রাতে বিস্ট্রোতে। অবশেষে সৌরিকের নতুন কেনা হাইল্যান্ড পার্কের ফ্ল্যাটে সঙ্গম। তখন সৌরিকের ফোকাস মৌনিষা। ও চাইছিল সৌরিক বিদেশে চাকরি নিয়ে গিয়ে ওখানেই থেকে যাক। আর এদিকে বাবা চাইছিল ছেলে কোম্পানির হাল ধরুক। মৌনিষার সিঙ্গাপুরে ট্র্যান্সফারে তাদের অন্তরঙ্গতায় ছেদ। ও কদিনেই সিঙ্গাপুরের এক ছেলেকে বিয়ে করে ফেলে। এদিকে মা-বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে সৌরিক নিজের এবং বাবার কোম্পানি সামলাতে ব্যস্ত। আউটসোর্সিংয়ের কাজের ইচ্ছে।

ক্লান্তিকর চড়াই উতরাইয়ের কাজের মাঝে সময় ছিল না অন্য দিকে মন দেওয়ার। যতক্ষণ না অস্মিতা এল তার জীবনে। অস্মিতা নিয়ে এল তার জীবনে শান্তি। নতুন করে কাজের উদ্যম। কিছুদিন

পরে রুচিরা ওদের জীবনে এল এক পূর্ণতা নিয়ে। এখন রুচিরার দেখাশোনা। যতদিন না অস্মিতা ফিরে আসছে। এই অঘটন, মহামারীর মাঝে এক নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে।

***

সৌরিক ঠিক করল রায়তি বা প্রাঞ্জলের সঙ্গে কথা বলার আগে, রায়তির দ্বিচারিতার ব্যাপারটা খাতিয়ে দেখবে। ওর সঙ্গে চ্যাট, রায়তির অন্য সোশাল প্রোফাইলের সঙ্গে মেলে না। তা হলে কোনটা সত্যি? সৌরিকের অনুমান, এখানে কিছু অবাস্তবতা আছে। একটা উহ্য পরিচয় যা এক্সট্রা রোজগারের ইঙ্গিত করে। প্রণয়ঘটিত, নয়তো কী? ওর থেকেই তো সব চেয়ে সহজে এক্সট্রা ক্যাশ পাওয়ার সম্ভাবনা। আকাশ পাতাল ব্যবধান মধ্যবিত্ত বুটিকের কর্মীর সঙ্গে ঝাঁ চকচকে সোশাল প্রোফাইলের রায়তির।

উদ্দেশ্যবিহীন তো না। এই অনির্দিষ্টতা ঐশিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আসল কারণও হতে পারে। প্রাঞ্জলের সঙ্গে কথা বলার জন্য জুতসই কাঠামো। এই কোয়ারান্টিনে এর থেকে বেশি উপায় আর চোখে পড়ছে না।

বেনামে যদি রায়তির সঙ্গে গল্প শুরু করে তাহলে একটা আন্দাজ করতে পারবে। স্ন্যাপচ্যাটে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলল অর্ক মুখার্জি নামে ওর জিও নম্বরে। রায়তিকে খুঁজে বার করে অ্যাড করল।

ও রেসপন্ড করবে কি না বুঝতে না পেরে একটা মেসেজ পাঠাল *'চ্যাট করতে চাই। কখন সময় হবে?'*

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর *'এখন'*

আহ! এই তো। এখন সন্ধে। দু পেগ সিঙ্গল মল্ট নেমেও গেছে। মুডটাও পারফেক্ট প্রণয়শীল চ্যাটের। প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল অস্মিতার সঙ্গে সব চ্যাট।

সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। প্রচণ্ড ঝড়জলে ওরা দু-জনে আটকা সরিকের অ্যাপার্টমেন্টে ''এই বৃষ্টিতে ড্রাইভ করে যাওয়া ঠিক হবে না। থেকে যাও''

রাতে থাকার কথায় অস্মিতা ইতস্তত করে বলেছিল ''মা খুব চিন্তা করবে''

''একটা ফোন করে দাও''

করেছিল। ততদিনে ঐশিকা বুঝে গেছে সৌরিক তার জামাই হতে চলেছে। আবহাওয়া বেগতিক দেখে রাজি হয়ে গেছিল ঐশিকা। ঝড়জলে বারান্দা ভিজে যাচ্ছে দেখে সৌরিক প্যাটিওর দরজা বন্ধ করে বার ক্যাবিনেট থেকে রেমি মার্টিন ওকে দিল। শিহরিত অস্মিতা ভাবল ব্রান্ডি ওকে ধাতস্থ করবে।

''চিয়ার্স'' কাচের ঠোকাঠুকি।

বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব প্যাটিওর দরজা প্রায় ভাঙতে বসে। সৌরিক রিচার্ড ক্লেডারম্যানের বাজনা চালিয়ে দিল ওর বোস সেভেন-ইন-ওয়ান স্পিকারে। ঘরের কোণে ল্যাম্পের আলোয় মোহিনী আমেজ। দ্বিতীয় পেগে ব্যালাড পো অ্যাদেলিন ঠিক সেই আমেজের তালে।

গান শুনতে শুনতে, ব্র্যান্ডিতে চুমুক। পাশে বসে অস্মিতাকে আদর করল। লিকিওর যখন সেরিব্রমে, নেশার ঘোরে অস্মিতা সৌরিকের গলা জড়িয়ে ঠোঁটে চুমু খেল। সঙ্গে সঙ্গে সৌরিকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিহরণ! নতুন ছন্দ খেলছে নিম্নাঙ্গে। অস্মিতার কোমর জড়িয়ে চুমুতে ওর সুপ্ত কামনা প্রকাশ্যে।

সুতির লহেঙ্গা-চোলিতে অস্মিতা জানলা খুলে দিল ভেজা বাতাসের ঘ্রাণ নিতে। বাতাসের ঝাপটায় গালে কোমল স্পর্শ। হাওয়া উড়ছে রেশমি কেশ।

"একটা সিগারেট দেও তো" অস্মিতা সৌরিকের দিকে হাত বাড়াল।

ইন্ডিয়া কিংসের ধোঁয়া ছুড়ে দিল অরক্ষিত প্রলয় আঁধারে। হাইল্যান্ড পার্কের আলোর রোশনাই ছাড়া চারদিক সুনসান। তারাদের দিকে তাকিয়ে, স্তিমিত হয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়ে হারিয়ে গেছে রহস্যময় অনুধ্যানে। নিজেকে মনে হচ্ছে শান্তির দেবী। বুঝতে চেষ্টা করছে সে কি সেই 'কুইন অন এ চ্যারিয়ট' – সুস্থির শান্তিতেও দৃঢ়। ওর হাওয়ায় ওড়া চুল, চোলিতে আবরিত পূর্ণ ভরাট বক্ষযুগল, তন্বী নাভিস্থল কী মর্তে ইসলাম-পূর্ব দেবী আল-লাটের প্রতিবিম্ব? গভীর কালো নাভির জাদু বাড়িয়ে দিয়েছে ঘাগরায় আবরিত ভরাট নিতম্বের পূর্ণতাকে।

সৌরিক কিচেনে গতকালের মুর্গির ঝোল, ভাত গরমে ব্যস্ত। দু-জনেই নিঃশব্দে রাতের খাওয়া শেষ করল। খাওয়ার শেষে অস্মিতা সোফার ওপর দেহটাকে এলিয়ে দিল। সৌরিকের চোখ ওর অর্ধশায়িত অবয়বের মহিমা আস্বাদনে ব্যস্ত।

এক হাতে অস্মিতার স্তন নিয়ে খেলা। অন্য হাত ঘাগরার নীচ দিয়ে ওর ঘন অরণ্যের মাঝে খেলে বেড়াচ্ছে। সৌরিক আরও নিবিড় করে কাছে টানতে, নিঃস্পৃহ অস্মিতা ওর ইরেকশন অনুভব করছে। সৌরিক খেলে চলেছে ওর স্তন নিয়ে। ঘাগরার নীচের হাত ক্রমশ অরণ্য ছাড়িয়ে গভীরে উত্তেজিত, জাগ্রত করছে ওর পুরো সত্ত্বাকে।

দু-জনেই তখন ভালোবাসার ময়ূরপঙ্খিতে সওয়ার। অস্মিতা নিজেকে ছাড়িয়ে বাথরুমে। নগ্ন শিথিল পায়ে ঘরের আলো আঁধারিতে। মন্ত্রমুগ্ধ সৌরিক উন্মোচিত অস্মিতার মায়ায় সিক্ত। যেন রাতের আঁধার রিচার্ড ক্লেডারম্যানের নতুন সুরের মূর্ছনার সিম্ফনি বাজাচ্ছে দুটি আবরণহীন দেহে।

ওর যৌনাঙ্গ নিয়ে অস্মিতার খেলা, স্তনের নিষ্পেষণ, ক্লেডারম্যানের বাজনার তাল ধীরে ধীরে ক্রেসেন্ডর দিকে উঠছে। সৌরিক যখন চুমু খেতে ব্যস্ত, অস্মিতার হাতের জাদুতে সৌরিকের নিম্নভাগ বহ্নিশিখার মতো অঙ্গার কামার্ত উন্মাদনায়। স্তনে চুমুতে দেহে আনন্দের শিহরণ। ও আরও নিবিড়

করে টেনে নিল সৌরিককে। ভগাঙ্কুরে হাতের কারসাজি যেন আনন্দ উল্লাসকে তীব্রতর করছে। সৌরিকের প্রবেশে, সে ছন্দ সুখসাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কামনার শিখরে। দুটি একাত্ম দেহের সম্ভোগের ছন্দ আছড়ে পড়ল বাইরের বর্ষার নিভৃত গোপনে প্লাবনে। পরিচিত সুখের মেঘমল্লারে। ওদের ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘশ্বাসে পৌঁছে গেল আনন্দের সপ্তম মার্গের নিখাদে। একে অপরের বাহুডোরে।

রায়তির সঙ্গে নির্দিষ্ট যৌন চ্যাটের মানসিক প্রস্তুতি নিতে সৌরিক ফিরে গেছিল অস্মিতার সঙ্গে মিলনের সেই রাতে। আশায় রায়তির এই অতি আধুনিকার রূপ উদ্‌ঘাটন করতে পারবে।

বন্ধুর একটা ছবি বার করে গুছিয়ে বসল সৌরিক। যদি সেটা প্রয়োজন হয়।

এবার স্ন্যাপচ্যাটেঃ

হাই! আমি অর্ক। রায়তি?

হ্যাঁ। আমার সঙ্গে চ্যাট করতে ইচ্ছুক কেন?

নামটা। রায়তি মানে চাষ করার জমি।

আমার নামের মানে আছে বলে তো জানতাম না।

তোমার নামের মানে তো বলে দিলাম। বিস্তৃত অর্থে মানে হল, স্বচ্ছন্দ, পরিস্রুত কিন্তু তেজস্বী। কম হলেও জীবনে শৌখিন জিনিসপত্রের আকাঙ্ক্ষা। সব কিছুই স্থগিত বা মুলতুবি করাটাই সবথেকে বড় খামতি। যে সব লোকেদের প্রচুর প্রবলেম তাদের আকর্ষণ কর।

এটা কোথার থেকে পেলে?

কাবালারিয়ান ফিলসফি। ক'দিন আগেই পড়েছি।

জানি না। কোনও দিন শুনিনি। তোমার প্রবলেমটা কী?

লকডাউনের মধ্যে অনাহার!

খাবার নেই?

না। সেক্স নেই। চাষের জমি খুঁজছি।

মনে হয়, বিয়ে হয়নি। আমাদের সবারই একই প্রবলেম। নয় কি?

তার মানে তোমারও বিয়ে হয়নি।

একদম ঠিক। তবে ফিজিক্যাল সেক্সই তো মুক্তির একমাত্র পথ নয়।

অন্য উপায় আছে?

সাইবার সেক্স।

চ্যাট করে আমার কোনও উত্তেজনা আসবে না।

ভয়ারিজম?

তা হতে পারে। কিন্তু দেখব কোথায়? ভারতে পর্ন ভিডিও নিষিদ্ধ।

আমি দেখাতে পারি। অবশ্য খরচ আছে।

এখন?

যখন তুমি রাজি।

কত?

আধ ঘণ্টার জন্য দু-হাজার।

কীভাবে দেব টাকাটা?

ফোন পে, পেটিএম অথবা গুগল পে।

শোটা যে ইরোটিক হবে তার কী গ্যারান্টি?

আমি। ভরসা রাখো। ঠকবে না। আমাকে তোমার ছবি পাঠাও।

সৌরিক ওর বন্ধুর ফোটো পাঠিয়ে দিল। রায়তি ফেরতে পাঠাল একটা বার কোড। যা ভেবেছিল, তাই। রায়তি বেশ্যা।

তোমারটাও পাঠাও টাকা দেবার আগে।

ইরোটিক পোশাকে ওর ছবি এল। রায়তি তার সাজ সরঞ্জামে আকর্ষণের ব্যবসায় তৈরি। এই ছবিটাতে ওকে নতুনভাবে দেখাচ্ছে। লোভনীয়, আনন্দদায়ক, উত্তেজক। সৌরিক বুঝল, এটা রায়তির প্রথমবার নয়। ডিজাইনারের দোকানের মাইনের ওপর বাড়তি রোজগার দরকার। সৌরিক টাকা ট্রান্সফার করে দিল।

রেডি?

হ্যাঁ।

ভিডিও চালাও। শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে আটকাবে না।

তারপরের আধ ঘণ্টা চলল ওর ইরোটিক স্ট্রিপ্টিজ। প্রলোভনকারী অঙ্গভঙ্গি সহ। কিছু করার নেই। এছাড়া কোনও উপায়ও নেই। এসবের পেছনে যে অলক্ষিত দিকটা আছে, সেটা বুঝে নিতে হবে। শেষ হয়ে গেলে সৌরিক ভিডিও বন্ধ করে দিল।

দারুণ!

ওকে এখন যেতে হবে। এই লকডাউনের অনিশ্চয়তায় টপ-আপ করতে।

যদি ইচ্ছে করে তবে আবার এস। যদি গ্রিন জোনে থাক তোমার বাড়িতেও চলে যেতে পারি।

বাহ! বেশ। এখন যেতে হবে, বুঝতেই পারছ।

সৌরিক চ্যাট শেষ করে রেহাই পেল। এত নীচে নামতে পারে নিজেও জানত না! অস্মিতার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ও কী ভাববে এসব জানতে পারলে! যাক গে। রায়তির সঙ্গে আবার কথা বলতে হবে প্রাঞ্জলের সঙ্গে কথা বলার আগে। সৌরিক চিন্তা করছিল... এটাই হয়ত ওর কিছু বাড়তি রোজগারের একমাত্র পথ। ওকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। বাংলায় এখন যা পরিস্থিতি, চাকরি থাকবে কি না ঠিক নেই। টাকার টানাটানি। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এখন রোজগার বাড়াবার উপায় খুঁজছে। কারোকে তো পুরো পরিবারের ভরণপোষণের ভার নিতে হচ্ছে। অন্তত ও তো কাউকে ঠকাচ্ছে না বা লুট করছে না। ও নিজের লক্ষ্মণরেখার মধ্যেই একটু ভালো থাকার চেষ্টা করছে।

সৌরিক ওকে ক্ষমা করে দিল। শুধু এই প্রার্থনা অস্মিতাও ওকে ক্ষমা করে দিক ওর এই মিসঅ্যাডভেঞ্চারের জন্য। কিন্তু ঐশিকাকে যে খুন করেছে তাকে ক্ষমা করতে পারবে না। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ওই খুনিকে ও খুঁজে বার করবেই।

***

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার নতুন করে সব শুরু করা অগ্নিদেবের পক্ষে সহজ হয়নি। কারিয়ার, আদর্শ, হারানো প্রেম, বড় দাদার অকাল মৃত্যু... নোঙর বিহীন নৌকাটা অতলে হারিয়ে যাচ্ছিল। কোথা থেকে শুরু করবে ঠাহর করতে পারছিল না। তার ওপর জেলখানায় অকথ্য অত্যাচার। বাড়ি ফিরে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল নিজেকে সামলে নিতে।

“কী করবি ভেবেছিস?” বাবার চিন্তা।

“জানি না। একটা ডিগ্রি ছাড়া তো চলবে না। প্রাইভেটে গ্রাজুয়েশনটা শেষ করতে হবে”

“ভালো। তাই কর”

আবার পড়াশোনা। গ্র্যাজুয়েশন শেষ হল। আদতে মেধাবী ছেলে, নিষ্ঠাবান, তাই শেষ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করল যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে। লক্ষ্য আইএএস। পরীক্ষার জন্য যখন তৈরি হচ্ছে বাবা হঠাৎ মারা গেল। সংসারের পুরো দায়িত্ব ওর ওপর। পড়াশোনা শিকেয় তুলে হন্যে হয়ে তখন চাকরি খোঁজা। যা পাবে তাই নিতে হবে।

সরকার তখন পুলিশ ক্যাডরে রিক্রুটমেন্ট শুরু করেছে। ভাগ্যে যা হওয়ার। অগ্নিদেব চাকরি পেয়ে গেল। পুলিশ কনস্টেবল! তাতে কী? সরকারি চাকরি, নিয়মিত মাইনে! পরিবারকে বাঁচাতে হাতে এটাই একমাত্র পথ। বাবা স্কুল টিচার ছিলেন। বিশেষ কিছুই জমাতে পারেননি, মা গৃহবধূ। ওর মাইনেতেই সংসার খরচ। এত ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও কনস্টেবলের চাকরি। চোখ বন্ধ করে তার গতে এগোনো।

সরকারের লক্ষ্য নতুন মদের দোকান খোলা। সে এক ঝক্কি! মদ্যপগুলো হামলে পড়বে দোকানে। তার চেয়েও ঝামেলা প্রত্যেক ক্রেতার আধার কার্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে তার বাড়ির ঠিকানা। সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের জন্য একটা স্পেশাল ফোর্স পাঠাতে হবে।

ওর বিধাননগর এলাকায় প্রায় সাতখানা দোকানকে এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট অনুমতি দিয়েছে মদ বেচার। সেগুলোতে পর্যবেক্ষণ ফোর্স পাঠাতে হবে। কারণ বাসিন্দারা অধৈর্য। সকলেই উদগ্রীব সরকারের এই দুরবস্থায় অর্থ দিয়ে মদ কিনে সরকারের পাশে দাঁড়ানো। পরে রিপোর্টে জানা গেল একদিনের বিক্রিতে যত লাভ, পাকিস্তানের জিডিপির থেকেও বেশি! ছ'ফিট দূরত্ব বজায় রেখে লাইন নিয়ন্ত্রণ। তেমনই নির্দেশ সরকারের। সেটা ঠিকমতো প্রয়োগ করাই অগ্নিদেবের দায়িত্ব।

ঐশিকার মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন এখন গৌণ। যদি না সৌরিক কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। সৌরিককে ফোন করল অগ্নিদেব ‘‘তদন্ত কেমন চলছে?’’

‘‘ঢিমে তালে। সবাইকে এখনও ফোন করা হয়নি, খুনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে চাইছি আগে’’

‘‘চালিয়ে যাও। আমার মোটেই সময় নেই এখন এটা দেখার’’

‘‘বলতে পারেন এই লকডাউন কতদিন চলবে?’’

‘‘নো ক্লু। সেপ্টেম্বর অবধি তো বটেই, আরও বেশি দিন চলতে পারে। আস্তে আস্তে খুলবে সব।’’

‘‘আশা করা যাক। এখন তবু কিছু আউটসোর্স-এর কাজ আছে। নতুন কোনও কাজ আসছে না এই মন্দা অর্থনীতিতে’’

‘‘বেশ কিছুদিন অর্থনীতির এই মন্দাবস্থা থাকবে। যাক গে, তুমি চালিয়ে যাও। যদি কিছু পাও জানিও’’

অগ্নিদেব বেশ কায়দা করে কাজটা নিজের ঘাড় থেকে সরিয়েছে। সৌরিক ভাবছে এটা সত্যিই কাজের চাপে, নাকি ইচ্ছাকৃত। যাই হোক, এখন যখন সৌরিকের কাঁধে, তখন ও মাথা খাটিয়ে এর মূলে পৌঁছবেই।

ফোনটা রেখে অগ্নিদেব চিন্তা করছিল সৌরিক আদৌ এই রহস্যের সুরাহা করতে পারবে কি না কোনও ট্রেনিং ছাড়াই। ওর হাতে তো এছাড়া আর কোনও অপশনও নেই। যদি করতে পারে এটা উপরি পাওনা।

‘‘স্যার, অ্যামব্রোসিয়ায় ঝামেলা হয়েছে’’ ডিউটি অফিসারের ফোন।

‘‘এক্ষুনি আসছি’’

অগ্নিদেব নিজের গিয়ার তুলে ডিডি ব্লকের দিকে। দূরত্ব বজায় রাখাটা এখন মুখ্য। সরকারের খরচ হলেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে দেওয়া যাবে না। অর্থনীতি স্থিতিশীল হতে দেরি আছে। কিন্তু ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করাটা অত্যন্ত জরুরি।

***

রায়তির সঙ্গে দ্বিতীয়বার হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলার আগে সৌরিকের মাথায় পুরো ব্যাপারটা নাড়াচাড়া করছিল। পরের বারের কথোপকথনের একটা ছকও করে নিচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়ল রায়তি বলেছিল *'প্রাঞ্জলদা কিছু বলতে পারে'*। ও কী করে জানে যে প্রাঞ্জল বাগচি মায়ের অন্য লিংকের কথা জানতে পারে যদি না ওর খুব কাছের লোক হয়? প্রতিবেশী কখনও আর কারও সম্বন্ধে এরকম কিছু বলবে না যদি না খুব কাছের লোক হয়। তার মানে প্রাঞ্জল রায়তির প্রতিবেশীর থেকেও বেশি। বয়ফ্রেন্ড, বাগদত্তা নাকি খদ্দের? স্ন্যাপচ্যাটের পর খদ্দের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই সীমাবদ্ধতায় তার সত্যান্বেষণের সুযোগ বড়ই কম। ওকে কথার ফাঁকে ধরতে হবে।

সৌরিক ঠিক করল জিজ্ঞাসাবাদের ছক আগে কষে নিয়ে তারপর ফোন। রায়তি সাদাসিধে হওয়ার ভান করলেও, আসলে তা নয়। এমন না, যে ঐশিকাকে খুন করতে পারে। কিন্তু অ্যালিবাই তো হতে পারে। প্রাঞ্জল বাগচির থেকে ওকে চাপ দিয়ে কথা বার করাটা সহজ। অগ্নিদেব আগেই বলে দিয়েছে ওদের কথোপকথন। হয়ত সবার মিলিত অবদান আছে খুনের আসল উদ্দেশ্যতে। প্রত্যেকটি লোককেই খুব ভালো করে যাচাই করতে হবে।

আপাতত মাথা থেকে ওসব বার করে রান্না ঘরে গেল। আগের দিনের চাউমিন শেষ হয়ে গেছে। ফ্রিজার থেকে মটন বার করে জলে রাখল বরফ গলার অপেক্ষায়। তারই মধ্যে পেঁয়াজ আর সবজি কেটে ফেলল। একঘণ্টার মধ্যে মটন কারি রেডি। দুটো বাটিতে ভাগ করে রাখল ঠান্ডা করতে। ঘেমে-নেয়ে একাকার। সোজা স্নানে। রুচিরার অনলাইন ক্লাস শেষ হতেই ওকে ডেকে বাবা-মেয়ে খেতে বসল। তারপরই দুপুরের ঘুম।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল। চা নিয়ে রায়তির সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিওচ্যাটে ''ব্যস্ত?''

রয়তীও সম্ভবত ঘুম থেকে উঠেছে ''এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠলাম''

''পরে ফোন করব?''

''না, না। এক মিনিট, মুখ ধুয়ে আসছি'' ফোনটা বিছানায় রেখেই চলে গেল! স্ক্রিনে সিলিং দেখাচ্ছে! সৌরিক কপালের ঘাম মুছল। এখন মে মাসের মাঝামাঝি। একটু গরম লাগছে। এ বছর লকডাউনের জন্য পলিউশন অনেক কম। গাড়িও চলছে না। সব মিলিয়ে গত বছরগুলোর মতো তেমন গরম নেই। না হলে মে মাসে এসি ছাড়া টেকা দায়। দু-মিনিটেই রায়তি ফিরে এল। ভিডিও দেখে যা বুঝল সৌরিক, রায়তি দরজা আটকানো বন্ধ ঘরে। ওর মুখটা আবার ভেসে উঠল স্ক্রিনে ''সরি, বসিয়ে রাখলাম''

''না, না। কোনও তাড়া নেই''

স্ন্যাপচ্যাট ভিডিওটার থেকে রায়তিকে বেশ অন্য রকম দেখাচ্ছে। এখন অবশ্য জামা-কাপড় পরা। তবে কোনও মেক আপ নেই। একদম স্বাভাবিক! গোলাপি জামা পরা। কোনও মিলই নেই আগের স্ন্যাপচ্যাট ভিডিওর প্রলোভনী পোশাকের সঙ্গে। সৌরিকের মনে পরে গেল ওর নগ্ন দেহ।

“প্রাঞ্জলের সঙ্গে কথা বলেছেন?”

প্রাঞ্জল! প্রাঞ্জলদা না? অবাকই হল। তা হলে ওর অনুমানই ঠিক। প্রতিবেশীর থেকেও বেশি কিছু আছে ওদের মধ্যে। যৌন সম্পর্ক, নাকি অপরাধের সঙ্গী?

“না, এখনও না। একজন অপরিচিত হয়ে দুম করে এ প্রসঙ্গ তোলা যায় না, কোথা থেকে জেনেছি না বলে”

“আমার নাম বলতে পারতেন”

“আপনারা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ? না হলে অস্বস্তিকর লাগবে”

রায়তি চুপ করে গেল, সৌরিক ওর এই থেমে যাওয়াটা মাপতে লাগল। একটু ইতস্তত করে শেষে একটা উত্তর এল “মানে ওই আর কি। ও বুঝতে পারবে”

“অনেক ধন্যবাদ। এখন তাহলে নির্দ্বিধায় কথা বলা যাবে। উনি আপনার থেকে বেশি জানবেন?” সৌরিক ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা করল আঁচ করতে রায়তি কতটা এর মধ্যে জড়িয়ে।

“ও অনেক গুছিয়ে বলতে পারবে। আমি অত পারি না”

“ধন্যবাদ, বিরক্ত করলাম। এখন নিশ্চয়ই খুব অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। দোকান বন্ধ। রোজগারও নিশ্চয়ই কম”

“হ্যাঁ, অসুবিধা তো নিশ্চয়ই। তবু তার মধ্যেই চলতে হবে। আশা করি তাড়াতাড়ি সব ঠিক হয়ে যাবে”

“মা থাকলে আপনার একটু সুবিধা হত”

“হ্যাঁ, কিন্তু বিধাতা বিরূপ। লকডাউন শেষ হলেও টলি ইন্ডাস্ট্রি কতটা সক্রিয় হবে জানি না। কসটিউম সাপ্লাইতে অবশ্যই টাকার খামতি দেখা দিতে পারে”

“অন্য কোনও উপায় চিন্তা করছেন?”

“অনলাইনে কিছু করার চেষ্টা করে দেখছি”

সৌরিক জানে কোন লাইন। দেখেছেও সেক্স বিক্রির ভয়ারিজম। ওই টাকায় কদ্দিন চলবে? সংসার চালাতে যথেষ্ট? হতে পারে। সৌরিকের কোনও ধরণা নেই ওই জগৎটার ব্যাপারে। খারাপ লাগল মেয়েটির জন্য। এই দুরবস্থায় বাঁচার উপায় খুঁজছে। ঐশিকা বেঁচে থাকলে হয়ত অন্য রকম হত। প্রাঞ্জল আর ও মিলে হয়ত কিছু করার চেষ্টা করছে।

“অনেক ধন্যবাদ আপনার সময়ের জন্য। আপনার নতুন কাজ সফল হোক”

‘‘ধন্যবাদ। সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন’’ ফোনটা কেটে দিল।

প্রাঞ্জলের সঙ্গে কথা বললে আরও কিছু জানা যেতে পারে। বিশেষ করে অগ্নিদেবের কাছ থেকে যা জেনেছে। প্রাঞ্জলের কোনও ব্যবসায়িক সম্বন্ধ আছে রাস্তগির সঙ্গে। তাই তার সঙ্গে সাবধানে এগোতে হবে। এই প্রমোটার ডেভেলপাররা সব ধোঁয়াটে চরিত্র। গুন্ডা পোষে। যখনই বেকায়দায় পড়ে তাদের কাজে লাগায়। ওর এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার সম্ভাবনা প্রকট। প্রাঞ্জল রাস্তগি অবধি পৌঁছনোর মাধ্যম মাত্র।

***

অস্মিতা অখিলেশ সোনির ফোন পেয়ে অবাক।

স্কুলের দিন থেকেই চেনে, যখন মায়ের হাত ধরে শুটিং ফ্লোরে ঘুরে বেড়াত। মা যখন শুটে ব্যাস্ত, অখিলেশ ওকে চকলেট দিয়ে আদর করত। তখন অত আমল দেয়নি। কলেজে উঠে মায়ের শুটে আর যেত না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাই বেশি পছন্দ।

কলেজের শৌনক ওর প্রেমে হাবুডুবু ‘‘চল মিলেনিয়াম পার্কে যাই। নৌকাও নিতে পারি। যাবি?’’

মিলেনিয়াম পার্কে হাঁটা ঠিক আছে, কিন্তু নৌকা! ওটা তো নষ্টামির জায়গা। ছেলেমেয়েদের অল্প খরচে নৌকার ঢিমে হ্যারিকেনের আলোর ছাউনিতে গঙ্গার বুকে লীলাখেলা। ওর কোনও ইচ্ছেই নেই ওসবে। শৌনককে ওর না-পসন্দ।

‘‘নিশ্চয়ই! চল আমরা সবাই মিলে যাই’’

বন্ধুদের উসকোতেই সকলে হৈ হৈ করে চলে যেত মিলেনিয়াম পার্কে। সন্ধের হালকা ঠান্ডা বাতাসে জমিয়ে আড্ডা। সন্ধে নেমে আসতে হেঁটে প্রিন্সেপ ঘাটে। ওখানে তখন নদীর জলে সূর্যাস্তের হোলি। মুগ্ধ হয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে থাকত।

‘‘কেউ জানে এর নাম কেন প্রিন্সেপ ঘাট?’’

‘‘যেখানে বসে আছিস, এই পেলেডিয়াম পর্চ, স্বনামধন্য প্রাচ্যবিদ জেমস প্রিন্সেপ, যিনি সম্রাট অশোকের লেখা উদ্ধার করেছিলেন তাঁর স্মৃতিসৌধ হিসেবে গড়া’’ শৌনক ওদের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের কথা জানাল।

‘‘সূর্যাস্ত এখানে এক অপূর্ব সান্ত্বনা দেয়’’ অস্মিতা দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজের মনমোহিনী আলোগুলো দেখছিল। যেন গোধূলিকে বিদায় জানাচ্ছে। সন্ধ্যার মিষ্টি বাতাস ওর চুলের ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আপন মনে বলে উঠলঃ

‘‘যখন সূর্য অস্ত গেছে ওই সুদূরে
চাঁদমামার ঘুমপাড়ানি গান অন্তরে
সেসব স্বপ্ন, যা সুশোভিত করেছি আমরা

যেসব দূঃখ, যা নিয়ে বিলাপ করেছি আমরা।

আদরের কোমল স্বপ্ন, এখনও উড়ছে আকাশে

এই পৃথ্বীর ধোঁয়াশায়, গগনের থেকেও স্বচ্ছতায়''

স্মৃতিগুলো ভিড় করছে। তার হাত ধরে অখিলেশের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। তখন সে, প্রকৃতির অশেষ কৃপায় প্রস্ফুটিত যুবতী।

সেটা ছিল, ওবেরয় গ্র্যান্ডে একটা ফিল্মের ইভেন্ট। মায়ের অনুরোধে অস্মিতাও সঙ্গে গিয়েছিল। যদিও দুজনেরই এরকম ইভেন্টে যাওয়া পছন্দ নয়। এটা অবশ্য স্পেশাল। মায়ের শেষ ফিল্ম বক্স অফিসে গোল্ডেন জুবিলি করেছে। তা উদযাপন করতে শুধু নয়, মা-কে সংবর্ধনাও জানাতে। ঐশিকা এই অনবদ্য মুহূর্তটা অস্মিতার সঙ্গে কাটাতে ইচ্ছুক। তাই যাওয়া।

মা অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত। তাই অস্মিতা একটা টেবিলে হোয়াইট ওয়াইন নিয়ে বসে। এমন সময় অখিলেশ এসে জায়গা নিল ওর পাশে।

''অখিলেশ সোনি। আমাকে ভুলে যাওনি তো? দেখতে দেখতে কত্ত বড় হয়ে গেলে'' হেসে বলল অখিলেশ।

মাথা নাড়ল অস্মিতা। অবশ্যই তাকে চেনে।

''তোমার মা একটা রত্ন। ওঁর ছবি বক্স অফিসে যে মাত্রা ছোঁয় আর কেউ তার ধারে কাছেও যেতে পারে না'' কূট অখিলেশ নিজের ব্যবসা করতে জানে।

কিন্তু জানা ছিল না ফিল্মি জগতের বাইরে কীভাবে পা ফেলতে হয়। ফিল্ম প্রযোজক হিসেবে কাস্টিং কাউচে অগণিত মেয়ে পেয়ে অভ্যস্ত। কিন্তু অস্মিতা না টলি স্টার না ওই জগতে পা ফেলতে ইচ্ছুক।

চুপ করে ছিল। ড্রিংক শেষ হওয়াতে অখিলেশই বলল ''তোমার জন্য আরেকটা ড্রিংক নিয়ে আসছি'' খুব তাড়াতাড়ি ড্রিংক নিয়ে ফিরে এল ''খুব খুশি হয়েছি, তুমি এসেছ''

অস্মিতা দূরত্ব বজায় রাখল। কিছুক্ষণ কথা বলার পর অখিলেশ অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতে উঠে গেল।

এই দ্বিতীয় দফার শুরু। এখন অস্মিতার পূর্ণ যৌবন, অখিলেশ আকৃষ্ট হল ওর স্বভাব সারল্যে, যা ওই সিনেমা জগতে বিরল। ওর প্রলুব্ধকর নবীনতা দেখে অখিলেশ মা-মেয়েকে আমন্ত্রণ জানাল ওর লাউডন স্ট্রিটের বাংলোতে। ওর প্রোডাকশন হাউস চামুণ্ডেশ্বরী ফিল্মস ঐশিকার প্রায় সবকটা ছবিরই প্রযোজক। না করতে পারেনি ঐশিকা।

একদিন মা-মেয়ে দুজনেই পৌঁছে গেল ওর লাউডন স্ট্রিটের বাংলোতে। স্নিগ্ধজ্যোতি হলুদ সালোয়ার-কামিজে অস্মিতা সোফায় বসল। অখিলেশ ড্রিংক নিয়ে এল ''খুব ভালো তোমরা আসতে

পেরেছ'' তারপর অস্মিতার দিকে তাকিয়ে সোজা জিজ্ঞেস করল, ''মায়ের মতো ফিল্ম জয়েন করতে চাও?''

ঐশিকা তাড়াতাড়ি আপত্তি জানাল ''না, না। ওর ফিল্ম লাইনে আসার কোনও শখই নেই। ও পড়াশোনা করছে''

''সেটা ওকে ঠিক করতে দিন'' অখিলেশ ওর পাশে বসে আবার জিজ্ঞেস করল ''বেটি, তুমি ফিল্ম লাইনে যোগ দিতে চাও?''

অস্মিতা মাথা নাড়ল ''না। আমি এখন পড়া নিয়ে খুব ব্যস্ত। পরে কোনও মাল্টিন্যাশনাল ফার্মে কাজ করতে চাই''

''এখানে গ্ল্যামার, চাকচিক্য অনেক বেশি'' অখিলেশ লোভ দেখানোর চেষ্টা করল।

''তবুও না। গ্ল্যামার খুঁজছি না। সহজ স্থিতিশীল জীবন চাই।'' অস্মিতা আস্তে বলল।

ওরা রাতের খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরল। অখিলেশ আর জোর করেনি। অস্মিতা প্রায় ভুলেই গেছিল কথাটা।

পড়াশোনা শেষ করে অস্মিতা চাকরি খুঁজছে। বাংলার এমন অর্থনৈতিক দুরবস্থা যে চাকরি পাওয়া দুষ্কর। তাও চেষ্টা করে যেতে হবে। যখন প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম, তখন অফার এল ইউনিসিস গ্লোবসিন থেকে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, সারা দেশব্যাপী শাখা প্রশাখা। লাভজনক অফার। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও ভালো। উপরি পাওনা, বিদেশেও পাঠাতে পারে। ভয়ে ভয়েই গিয়েছিল ইন্টেরভিউ দিতে। যেমন অবাক তেমনই আনন্দ চাকরিটা পাওয়াতে।

আনন্দে আটখানা হয়ে যখন বেরোচ্ছে সেক্টর ৫ এর ইনফিনিটি বিল্ডিং থেকে, আচমকা লাউঞ্জে অখিলেশের সঙ্গে দেখা।

''তুমি এখানে?'' অখিলেশ এগিয়ে এল।

''একটা ইন্টেরভিউর জন্য এসেছিলাম'' হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দিল অস্মিতা।

''কোথায়?''

''ইউনিসিস গ্লোবসিন''

''পেয়ে গেছ কাজটা?'' অস্মিতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

''দারুণ খবর! চল একটা ট্রিট অবশ্যই পাওনা''

''ধন্যবাদ, আরেক দিন'' অস্মিতা এড়াতে চেষ্টা করল।

''কখনোই না। আজ তো স্পেশাল দিন। দোষ হবে যদি আমার সবচেয়ে বড় অর্থ উপর্জনকারী অভিনেত্রীর মেয়েকে না খাওয়াই''

অস্মিতা জানে টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ওর লাগামে। প্রত্যাখ্যান করলে মায়ের কাজের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। ওকে অসন্তুষ্ট করতে ভয়, পাছে মায়ের কেরিয়ারে সমস্যা হয়। আপত্তি সত্ত্বেও অখিলেশের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল। অখিলেশ ওকে নিয়ে গেল একই বিল্ডিঙয়ের ইকো সেন্টারের বিশ তলায়, অল্টএয়ার ক্যাপেলাতে।

দারুণ লাঞ্চ। সেই ফাঁকে অখিলেশ আসল কথাটা পাড়ল ‘‘বহু দিন হয়ে গেছে আমার বাড়িতে ডিনারের পর। এই উইক এন্ডে চলে এস’’

‘‘মায়ের সঙ্গে কথা বলে নিই’’ বেশ বুঝতে পারছিল অখিলেশের নজর ওর ওপর পড়েছে। এড়াবার জন্য বাহানা খুঁজছে।

‘‘ঠিক আছে। কথা বলে, জানিও’’

ঐশিকাকেও বলেছিল অস্মিতাকে এক রাতের জন্য পাঠাতে। ঐশিকা ক্ষিপ্ত। মুখের ওপর ‘না’ করে দিয়েছিল। এমন টানাপোড়েন যখন চলছে, তারই মধ্যে অস্মিতা সৌরিককে বিয়ে করে শান্তির জীবনে পা দিলে, অখিলেশের আশায় যবনিকা পতন।

ফোনটা বাজছে। অস্মিতা তুলল ‘‘তোমার, মায়ের খবরটা শুনে দুঃখিত’’

‘‘এত দিন পর!’’ অস্মিতার কটাক্ষ।

‘‘অপেক্ষা করছিলাম, তুমি একটু সামলে উঠলে কথা বলব বলে। আমাদের সকলের জন্য খুবই খারাপ খবর। বিশেষ করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য। কে জানে, কে এমন কাজ করল। এই লকডাউনের মধ্যে আমরা যখন সবাই ঘরে’’

‘‘পুলিশ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছে। আশা করা যায় কিছু একটা করতে পারবে’’

‘‘শুনলাম তুমি মাকে শেষ বারের মতো দেখতে যেতে পারনি। নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে’’

‘‘এখন আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠছি’’

‘‘আমার কাছে তোমার যদি কোনও দরকার হয়, নিশ্চয়ই বোলো। আমি আছি। আর একটা কথা, জানি না এখন বলাটা ঠিক হবে কি না’’

‘‘কী? বলে ফেলুন’’

‘‘কিছুদিন আগে একটা নতুন ওয়েব সিরিজের জন্য ঐশিকার অ্যাকাউন্টে ৫ লাখ টাকা ট্র্যান্সফার করেছিলাম। এখন যখন ও নেই তা হলে টাকাটা কী ফেরত দিতে পারবে? তোমার হাজব্যান্ড প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ফেরত দেবে’’

‘‘ও তাই বলেছে? আপনাকে পরে জানাচ্ছি’’

‘‘কোনও তাড়া নেই। সময় মতো দেখো। সাবধানে থেক। ভালো থেক। সব ঠিক করে আমাকে একটা ফোন কোরো’’

‘‘অবশ্যই’’

অখিলেশ লাইনটা কেটে দিল। অস্মিতা কোনও দিনই দেনায় থাকা পছন্দ করে না। সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অ্যাকাউন্ট, কনট্রাক্ট সব চেক করতে হবে। টেলিভিশন চালিয়ে দিল করোনার আপডেট জানতে। বিশেষ করে লকডাউন আর কতদিন চলবে। মরিয়া হয়ে উঠেছে কলকাতায় মেয়ে রুচিরার কাছে ফেরার জন্য।

ঠিক সেই সময় মোবাইলটা আবার বেজে উঠল। ওপর প্রান্তে সৌরিক ‘‘খুব তাড়াতাড়ি বল। তুমি কোনও অধীর বিশ্বাসকে চেন? মনে হয় চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত’’

‘‘না, চিনি না’’ অস্মিতার উত্তর।

‘‘কারও কাছ থেকে জেনে নিতে পারবে? আমার তো কোনও যোগাযোগই নেই ওই জগৎটার সঙ্গে। এই শর্মা তোমার মাকে হুমকি দিয়ে মেল করেছিল ‘*টাকা দিয়ে দিন। না হলে আর অভিনয় করতে হবে না*’’’

‘‘চামুণ্ডেশ্বরীর অখিলেশ সোনি একটু আগে ফোন করেছিল মাকে কী অ্যাডভান্স দিয়েছে, সে ব্যাপারে’’

‘‘হ্যাঁ।৫ লাখ ওনার অ্যাকাউন্টে। তাই তো দেখাচ্ছে’’

‘‘ওই সঠিক লোক যে বলতে পারবে’’

‘‘ঠিক আছে। ওর সঙ্গে কথা বলে যতটা পার খবর বার করার চেষ্টা কর। যদি সম্ভব হয় একটু গভীরে গিয়ে দেখ তো এই হুমকি কেন। অবশ্য যদি ও জানে’’

‘‘এখন মনে পড়েছে! তুমি রাস্তগির কথা বলেছিলে। ওই লোকটা মায়ের পৈতৃক বাড়িটা কিনতে চেয়েছিল’’

‘‘আর কিছু?’’ সৌরিক জিজ্ঞেস করল।

‘‘না। মায়ের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ও এত জোর করছিল। মা বলেছিল, শেষে হয়ত বিক্রি করেই দিতে হবে। লোকটা প্রমোটার। তাই কলাকৌশল জানে’’

‘‘এই অধীর বিশ্বাসের ব্যাপারে খোঁজ কর। মায়ের সঙ্গে ওর কীসের সম্পর্ক, জানা জরুরি।’’

‘‘আচ্ছা করব। তুমি খাবারের জোগাড় করতে পারছ?’’

‘‘হ্যাঁ, স্পেনসার্স বা বিগ বাস্কেট থেকে অর্ডার করি। ওদের কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকতে দেয় না। ওরা সিকিউরিটির কাছে রেখে যায়। আমাদের গিয়ে নিয়ে আসতে হয়?

‘‘রুচিরা কেমন আছে? কান্নাকাটি করছে না তো আমার জন্য?’’

‘‘আমরা সবাই করছি না কি?’’

“ওকে আমার আদর দিও। ওকে পরে ফোন করব। ভালো থেক। কী যে খারপ লাগছে। এই সময়ে এত দূরে...”

“আর কী করা। লকডাউন এত ঝট করে হয়ে গেল। তুমি কিছু তো আর করতে পারবে না। যাই হোক, চিন্তা করো না। দেখ এই লোকটার কিছু খবর জোগাড় করতে পার কি না। ভালো থেক।”

সৌরিক ফোন রেখে দিল। ওর এখন জেদ চেপে গেছে। মায়ের খুনিকে ধরতেই হবে। এত দূরে বসে অস্মিতাও ওর জেদের আন্দাজ পাচ্ছে। ওর উপস্থিতিই ওকে জোর দেয়, ভালোবাসা দেয়, জীবনের অর্থ বোঝায়। ওর নিষ্ঠা, ওর প্রতি শ্রদ্ধা জাগায়। ওর সহধর্মিণী হতে পেরে ভাগ্যবতী। যদি ওরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করতে পারে তা হলে, নিশ্চয়ই এই খুনের কিনারা করতে পারবে। ওর সাধ্য মতো চেষ্টা করবে।

এক অদ্ভুত দুঃখ শরীরে ছেয়ে। সৌরিককে খুব মিস করছে। ওর উপস্থিতি, ওর আদর, ওর নিবিড় ভালোবাসা।

***

অগ্নিদেবের সঙ্গে কথোপকথন, রায়তির সঙ্গে আলাপ এসব নিয়ে সৌরিক প্রাঞ্জলের ভূমিকাটা ঠিক কী কষে দেখার চেষ্টা করছিল ।

প্রাঞ্জল রাস্তগিকে দোষারোপ করতে পারে ওর ১০% কমিশন হারানোর জন্য। ঐশিকার মৃত্যুর জন্য ওই ডিলটা নষ্টও হতে পারে। কিন্তু তার থেকে এটা বলা যায় না যে, রাস্তগি খুনি। টাকা খোয়ানোর জন্য খুন! না, সেটা হজম হচ্ছে না। আরও কোনও উদ্দেশ্য আছে এই খুনের পেছনে। কী সেটা? রায়তি যদিও পুরোটা বলেনি, সৌরিক ওর সঙ্গে চ্যাট থেকে আন্দাজ করতে পারছে, প্রাঞ্জলের সঙ্গে ওর আরও কোনও সম্পর্ক আছে। শুধুই প্রতিবেশী নয়। বয়েফ্রেন্ড, শয্যাসঙ্গী নাকি আরও কিছু? আরও গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। দেখা দরকার প্রাঞ্জলের কী উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিদেবকে আগ বাড়িয়ে জানানোর, রাস্তগি এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত? কিছু তো লাভ আছে রাস্তগিকে গরাদের পেছনে পাঠিয়ে। অবাক কাণ্ড। সামান্য হিংসা নয়। তাহলে কী?

ও প্রাঞ্জলকে ফোন করল “সৌরিক চ্যাটার্জি। আপনার নম্বর পেয়েছি রায়তির কাছ থেকে। আমরা কথা বলতে পারি?”

প্রাঞ্জল অপেক্ষা করছিল অগ্নিদেবের ফোনের। তা না, এ কে? রায়তি যদি ওর নম্বর দিয়ে থাকে, তার মানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ থাকতে পারে।

“নিশ্চয়ই”

ভোডাফোন কানেকশন এই লকডাউনে একদম ভেঙে পড়েছে। হোয়াটসঅ্যাপে কল করি? ভিডিও কল করছি।”

‘‘অবশ্যই’’ প্রাঞ্জল লাইনটা কেটে দিল।

সৌরিক হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করল। প্রাঞ্জলের একটা স্ক্রিনশট নিতে পারবে, সেটাই উদ্দেশ্য। দাড়ি ঢাকা একটা মুখ ভেসে উঠল। চশমা পরা, তিরিশের কোঠায় হবে, সাধারণ মধ্যবিত্ত।

‘‘আমার পরিচয় দিয়ে নিই। আমি ঐশিকা রায়ের জামাই’’

‘‘আপনি রায়তিকে চেনেন কী করে?’’ প্রাঞ্জলের প্রশ্ন।

‘‘মায়ের সত্‌কারে এসেছিল। পরে যখন এসপি অগ্নিদেব চ্যাটার্জি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন আমি ওর ডিটেলস চাই। উনি আমাকে নম্বর দিয়েছেন। উনি আরও বলেন, আপনি ওঁকে ফোন করেছিলেন। রায়তির সঙ্গে কথা বলার সময়ও আপনার কথা বলেন’’

‘‘আপনার জন্য কী করতে পারি?’’

‘‘রায়তি বলেছে আপনি বেশি বলতে পারবেন ঐশিকা রায় সম্বন্ধে’’ অগ্নিদেবের কাছ থেকে যা জেনেছিল, চেপে গেল।

‘‘আমি একটা প্রমোটার ফার্ম নাইটিঙ্গল এন্টারপ্রাইজে কাজ করি। ঐশিকা ম্যাম একটা ডিল সাইন করেছিলেন ওনার হরীশ মুখার্জি রোডের পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে’’ অগ্নিদেবকে যা বলেছিল তার একদম উল্টো!

ভাগ্যিস অগ্নিদেবের সঙ্গে কথোপকথন বলে দেয়নি। এ তো এখন একই কথা অন্য রূপে! কেন এই দ্বিতীয় সংস্করণ? এই লোকটা হয়ত খুব পরিষ্কার লোক নয়। সৌরিকের এখন এই নতুন সংস্করণটা জানতে হবে।

‘‘উনি কি ডিলটা পূর্ণ করেছিলেন?’’

অপর প্রান্তে স্তব্ধতা। মনে হচ্ছে প্রাঞ্জল ছকে নিচ্ছে কীভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় ‘‘ওঁরা ডিলটা সাইন করেছিলেন। আমার বস রাস্তগিকে ম্যাম এক লাখ দিয়েছিলেন’’

‘‘উনি কেন টাকা দেবেন যদি ওনার বাড়ি প্রমোটারের কাছে বিক্রি হয়? আপনার ফার্মই তো ওনাকে টাকা দেবে। এটাই তো নিয়ম’’

‘‘সঠিক বলতে পারব না। আমার বস জানবেন। ওনাদের মধ্যে কি বোঝাপড়া হয়েছে, আমি জানি না’’

‘‘আপনি কী ওঁকে কখনও মিট করেছিলেন?’’

‘‘দু-একবার। দরকারি কাগজ দিতে... রাস্তগি পাঠাত। কীসের কাগজ, জানি না’’

‘‘আপনি তা হলে শুধু আপনার কাজই করছিলেন?’’

‘‘একদম ঠিক’’

‘‘রায়তি তাহলে এই খবর জানে কী করে? আপনি কী অফিসের সব কথাই ওকে বলেন?’’ প্রাঞ্জল শ্লেষটা ধরতে পারেনি।

‘‘না, সব সময় না। তবে হ্যাঁ, এটা বলেছিলাম’’

‘‘কোনও বিশেষ কারণ?’’

‘‘রায়া ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত। ম্যামের সঙ্গেও। ওনার কিছু জামাকাপড়ও বানিয়ে দিয়েছিল। ওর বাবার বুকে যখন স্টেন্ট বসানো হয় তখন উনি অনেক সাহায্য করেছিলেন’’

তা হলে এটা ঠিক। ঐশিকা রায়তির বাবার অসুস্থতার সময়ে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ‘রায়া’ কথাটা কানে লেগেছে। খুব ঘনিষ্ঠ না হলে কেউ এভাবে সম্বোধন করে না।

‘‘তাই, ওনার সঙ্গে দেখা করার আগে আমি রায়ার সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলাম। এত বড় তারকা। সেই আর কি। ওনার সঙ্গে কীভাবে কথা শুরু করব, সামলাব’’

‘‘কী সামলাবেন? আপনি তো শুধুই ম্যাসেঞ্জার। শুধু কাগজ দিয়ে চলে যাওয়া। বুঝতে পারছি না, আপনার সামলানোর কী ছিল?’’

প্রাঞ্জল চুপ। বুঝতে পারছে ভুল করে ফেলেছে ‘‘আমি বলতে চাইছিলাম ওনার সঙ্গে কীভাবে কথা বলব। কিন্তু স্যার, আপনি আমায় এসব প্রশ্ন করছেন কেন?’’

‘‘আমার স্ত্রী অস্মিতার অনুরোধে। কে খুন করতে পারে খুঁজে বার করতে’’

‘‘আমি করিনি’’ প্রাঞ্জল প্রায় চিৎকার করে উঠল।

‘‘কে বলেছে আপনি করেছেন? আমি?’’

‘‘না’’

‘‘আমি যা কিছু জানি না তা জানার জন্য। যেমন এই সম্পত্তির ব্যাপার। আপনি রায়তির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ, তাই না?’’

‘‘আমরা প্রতিবেশী’’

‘‘ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হল খুব ভালো মেয়ে। কত দিন চেনেন ওকে?’’

‘‘যবে থেকে ওরা আমাদের পাড়ায় এল। এই ধরুন পাঁচ বছর’’

‘‘এর আগে কোথায় থাকত?’’

‘‘কাছেই, বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে’’

মনে পড়ে গেল, সেই যবে থেকে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের মোড়ে বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের আড্ডা দিতে দিতে প্রথম দেখেছিল রায়তিকে। ওর স্বপ্নের পরি। তার তন্বী ঢেউ খেলানো দেহে প্রাঞ্জলের একাকী সিক্ত স্বপ্নে। রায়তির সারল্য তার তন্বী দেহের দোদুল্যমান স্তনের আকর্ষণে তার সুপ্ত কামনাবহ্নিতে ঘি ঢালছে। তার কামোদ্দীপক স্পর্শের স্বপ্ন বীর্যপাতে মুক্তি। রায়তির হট প্যান্ট, উপচানো দেহসম্ভার,

তার হিল্লোল উদ্বেল করত বলরাম ঘোষ স্ট্রিটের জীর্ণ রকে বসা প্রাঞ্জলকে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত যতক্ষণ না নিতম্ব-বক্ষ দুলিয়ে হারিয়ে যেত নিজের আশ্রয়ে।

সেই স্বপ্ন সত্যি হল যেদিন ওর পাশের বাড়িতে এসে উঠল। প্রথম দিকে সাহায্যকারী প্রতিবেশী হিসেবে। রায়তি কিন্তু ওর চোখ দেখেই বুঝে গেছিল। এর মধ্যে নাইটিঙ্গল এন্টারপ্রাইজের চাকরিটা হয়ে গেছে। রায়তি পাগলের মতো চাকরি খুঁজছে। ও এই কাজটা জোগাড় করে দিয়েছিল। স্টিচক্রাফট বুটিকের মালিক রাস্তগির বন্ধু। কিছুটা তোষামোদ করে চাকরিটা হয়ে গেল।

কৃতজ্ঞতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণের রূপ নিল। গঙ্গার ধার দিয়ে ঘণ্টআর পর ঘণ্টা হেঁটে-বসে কাটানো। উইক এন্ডে তাজপুর, মন্দারমণির সমুদ্রসৈকতে। ওখানে গোপন নিভৃতে স্বর্গসুখ। মন্দারমণির মসৃণ বিচে ঘুরে বেড়ানো। রাতে রিসর্টের নিভৃত গোপনে একে অপরের বাহুডোরে। ব্লু রিবন জিনে চুমুক দিতে দিতে ওর সুডৌল স্তন নিয়ে খেলা। সম্ভোগের সপ্তম মার্গে দেহে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে ওদের পুঞ্জিভূত স্বপ্নের পূরণে তৃপ্তি।

তারপর থেকে নিয়মিত বাইরে কোথাও না গিয়ে, রায়তির বাবা-মা বাড়িতে না থাকলেই, চুপিসারে ঘরে। ও খুলে ফেলত গায়ের জামা। প্রাঞ্জল বড় বড় চোখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত ওর উদোম শরীরের দিকে। ওর রোমশ দেহের নিষ্পেষণে, পুরুষাঙ্গের জাগরনে। প্রাঞ্জল যখন ওর স্তন নিয়ে খেলায় মত্ত, উন্মুক্ত যোনিদ্বার মেলে দিত শিশ্নের প্রতীক্ষায়। মত্ত দুই দেহ কামনার ছন্দে হারিয়ে যেত সুনামির প্রলয়ে। তখন এটা শুধু নিত্য অভ্যাস নয়, ওর অনুপস্থিতিতে স্বপ্নদোষও।

‘‘আপনি উত্তর কলকাতায় থাকেন?’’

‘‘নয়নতারা লেন। ওরা আগে যেখানে থাকত তার থেকে বেশি দূরে না’’

‘‘ওকে আগে থেকে চিনতেন?’’

‘‘ওই চোখের দেখা। আমি যখন ও পাড়ায় আড্ডা দিতে যেতাম। আমরা দুজনেই জানি রায়া ভালো মেয়ে। ও ঐশিকা ম্যাডামের মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত নয়। আমাদের পরিচিতি অপ্রাসঙ্গিক’’

‘‘নিশ্চয়ই। ও বলেছিল আপনি কিছু বলতে পারেন। ভেবেছিলাম রায়তি হয়ত কিছু জানে, যা আমি জানি না। যেহেতু আপনারা পরস্পরকে ভালো চেনেন’’

অপর প্রান্তে আবার একটা লম্বা স্তব্ধতা। হয়ত আন্দাজ করতে চাইছে রায়তি ঠিক কতটা বলেছে। কথার ফাঁদে পড়তে চায় না। সৌরিক অপেক্ষা করতে লাগল ওর বলার জন্য। শেষ অবধি প্রাঞ্জল মুখ খুলল ‘‘ঐশিকা ম্যাম আমাকে ব্যবহার করছিলেন যাতে রাস্তগির থেকে যতটা সম্ভব বেশি টাকা বার করা যায়’’

‘‘তার মানে আপনি পত্রবাহকের কাজ বাদেও দেখা করতেন?’’

‘‘হ্যাঁ, কয়েকবার ওনার সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে’’

‘‘শেষ কবে?’’

‘‘এই লকডাউন শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে’’

‘‘তা.. শেষ পর্যন্ত মানেজ করতে পেরেছিলেন?’’

‘‘হ্যাঁ, তবে মৌখিক। লিখিত ভাবে কিছু হয়নি’’

‘‘আপনার কী মনে হয়? ওনাকে কে খুন করতে পারে’’

‘‘বলা মুশকিল। তবে মনে হয় ওনার চলচ্চিত্র জগতের কেউ’’

‘‘কেন মনে হয়?’’

‘‘উনি বলেছিলেন, ওনার সাইন করতে একটু দেরি হবে। কারণ ওনার সঙ্গে অধীর বিশ্বাসের কিছু সমস্যা চলছে’’

‘‘এই অধীর বিশ্বাস কে?’’ সৌরিকের মনে পড়ে গেল ওর হুমকি মেলটার কথা। কিন্তু কিছু বলল না।

‘‘টলিউডের ডন। কোনও আর্টিস্টের ক্ষমতা নেই ওকে অমান্য করে। ওর প্রচুর পলিটিক্যাল কন্ট্যাক্ট’’

সৌরিকের গুলিয়ে গেল। কে এই লোকটা? এমন সব গল্প ফাঁদছে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অগ্নিদেবকে এক কথা বলেছে। এখন ওকে নতুন দুটো গল্প। অগ্নিদেবের কাছে রাস্তগিকে দোষারোপ করেছে। এখন এখানে অধীর বিশ্বাসকে। বুঝতে পারছে না কোনটা সত্যি। লোকটা ভীষণ ধূর্ত। শুধু সরল সাজার ভান করে। ও নিজে হয়ত ঐশিকাকে খুন করেনি, তবে সাহায্য করে থাকতেই পারে। কিন্তু কাকে? ওকে কথার প্যাঁচে ফেলে জানতে হবে। এই চ্যাট আরও বাড়ানোর আগে রায়তির থেকে আর কিছু জানা যায় কি না দেখতে হবে।

‘‘অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দেখি এই অধীর বিশ্বাসের ব্যাপারে আর কিছু জানা যায় নাকি। আপনার সঙ্গে আবার পরে কথা হবে’’

‘‘ঠিক আছে, যখন দরকার হবে, ফোন করবেন’’ ফোনটা রেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল প্রাঞ্জল বাগচি।

সৌরিক বোকার মতো বসে। এর কাছ থেকে কথা বার করা মুশকিল, যতক্ষণ না ওকে কর্নার করা যাচ্ছে। আর তা একমাত্র রায়তিই করতে পারে। এখন ওকে অপেক্ষা করতে হবে অস্মিতার জন্য। ও অখিলেশ সোনির কাছ থেকে অধীর বিশ্বাসের খবর জেনে জানাবে। এই লকডাউনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ওর পরিধিও সীমিত।

***

অগ্নিদেব সবে তৈরি হচ্ছিল। বেরবে, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল ‘‘সৌরিক, ব্যস্ত?’’

‘‘বেরচ্ছিলাম। কেন বল’’ অগ্নিদেব তাড়াতাড়ি কথা গুটিয়ে নেওয়ার চিন্তা করছিল।

“একটু সাহায্য লাগবে। মায়ের মেল বক্সে একটা মেল আছে, কোনও এক ‘হ্যাপ্লেস লোনার’-এর থেকে। অবশ্যই ছদ্মনাম। অপনার আইটির লোকেরা ওই সেন্ডারের আসল আইডি বার করে দিতে পারবে আইপি অ্যাড্রেস থেকে?”

“এখন অসম্ভব। কাজের চাপ অনেক বেড়ে গেছে, রোজকার ফ্রেস স্ট্যাটিসটিক্স দিতে হয়”

“তাহলে আমি ওর আইডেন্টিটি পাব কী করে?”

“দূর! স্টার ছিল। নিশ্চয়ই কোনও ফ্যান হবে। এখন এই সব ফ্যান মেলে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না”

“এটা কোনও ফ্যান মেল না। ওনার অতীতের ব্যাপারে কিছু হবে”

“ছাড়ো তো। এসব হচ্ছে বড় স্টার হওয়ার ঝক্কি”

“মনে হয় না এটা এমনি কোনও ফ্যান মেল। তা হলে মা ডিলিট করে দিতেন”

“ভুলে গেছেন হয়ত। আমার একটু তাড়া আছে, যেতে হবে। বাকি যা আছে তা দিয়ে চালিয়ে নাও” অগ্নিদেব ফোনটা রেখে দিল।

সৌরিক ভাবছে, এটা আদৌ জাঙ্ক মেল কি না। ওর আইডেন্টিটি খুঁজে পাওয়া যাবে কি না পরের কথা, কিন্তু ঐশিকা রায়ের যদি সত্যিই অতীতে কিছু থেকে থাকে তা হলে সেটা জানতে হবে। অস্মিতা কী জানবে? চেষ্টা করে দেখাই যেতে পারে। ওর অ্যাডপশনের আগে হলে জানবে না। যদি তেমন কিছু থেকে থাকে, এই খুনের উদ্দেশ্যে নতুন আলোকপাত করতে পারে। ওর পটভূমি জানতে পারলে পরে এই দিকটাতে নজর দেওয়া যাবে। আপাতত অন্য জরুরি কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে। ওর মৃত্যু বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত, অতীতের সঙ্গে নয়।

সরকার এখন ধাপে ধাপে লকডাউন তুলে নেবে। তারই প্রস্তুতি চলছে। কোথায় কোথায় লাল, কমলা আর সবুজ হবে তা নির্ধারণ করা... কাজের চাপ অতিরিক্ত বেড়েছে। কোন জায়গায় কতখানি ছাড় দেওয়া যাবে তা নির্দিষ্ট করা ওরই কাজ। মানুষ এত দিন বাড়িতে আটকা থেকে অধৈর্য। ওদের সামাল দেওয়াও কাজ বটে। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অগ্নিদেব বদ্ধপরিকর। তাই ঐশিকার মৃত্যু ওর কাছে তেমন জরুরি নয় যে, এক্ষুনি সুরাহা করতে হবে।

সল্টলেক স্টেডিয়াম গেটের কাছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অফিসে ড্রাইভ করে গেল অগ্নিদেব। পৌঁছে প্রথমেই সকলকে বোর্ডরুমে ডাকল মিটিংয়ের জন্য। সকলের কাছ থেকে অগ্রগতির ডিটেল ব্যাখ্যা নিল প্রতিটি অঞ্চলের। ওর কমিশনারেটের এক্তিয়ারে পড়ে সল্ট লেক, লেক টাউন, কেষ্টপুর, বগুইআটি, রঘুনাথপুর, তেঘরিয়া, অর্জুনপুর, কইখালি, রাজারহাট, নিউ টাউন, দমদম, কলকাতা এয়ারপোর্ট যা এনএসসিবিআই এয়ারপোর্টের ভেতরে, গৌরীপুর, মাইকেল নগর আর গঙ্গা নগর।

প্রত্যেক অঞ্চলের ইনচার্জ তাদের রিপোর্ট পেশ করল। রিপোর্ট দেখে এক একজনকে তাদের অঞ্চলের নিয়মাগুলো বুঝিয়ে দিল। কাজের চাপে সৌরিকের কথা একদম ভুলে গেছে। যখন বাড়ি ফিরছে, মনে পড়ল জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে সৌরিক তদন্তে কতটা এগোল।

ফোন করল, ‘‘সকালে ব্যস্ততার মধ্যে জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি কতটা এগোলে’’

‘‘খুব একটা না। এখনও চেষ্টা করছি ওদের সঙ্গে মায়ের লিংকটা কোথায় বার করতে’’

‘‘মোটিভ?’’

‘‘এখনও কিছু পাইনি। যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তাদেরই কেউ একজন লিড দিতে পারে’’

অগ্নিদেব মনে মনে হাসল ‘‘ভালো। এটা এখন তোমাকে কদিন ব্যস্ত রাখবে। অস্মিতা কেমন আছে?’’

‘‘চলছে এক রকম। ওর সাহায্য ছাড়া তো আমি একা কিছুই করতে পারতাম না’’

‘‘ওকে আমার শুভেচ্ছা জানিও। তোমাকে শুভ কামনা’’ ফোনটা রেখে দিল।

একজন সামান্য পুলিস কনস্টেবল থেকে তার উত্তরণ সহজ ছিল না। যদি ওই আদর্শের তাগিদে মেন লাইন থেকে সরে না যেত, আইপিএস অফিসার হতে পারত। বিভিন্ন অস্থির এলাকায় পোস্টিং, হুমকির মোকাবিলা করা ওর রোজকার কাজ। তার ওপর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের খুশি রাখা, কখনও নিজের নীতির বাইর গিয়ে! সব থেকে কঠিন উৎসাহী কাজ বিভিন্ন অপরাধীদের তদারক। এখন রিটায়ারমেন্টের মুখে কাজের গাফিলতি হয়েছে বলে নিজের নাম কলঙ্কিত করতে চায় না। পুলিশের হাতে এত নির্যাতন সহ্য করেও সারা জীবন পুলিশের কাজে নিজের সবটুকু দিয়ে সেবা করেছে। ঐশিকার খুনের সুরাহা করে আর নতুন কিছু হবে না। তার চেয়ে যেমন চলছে তেমন চলতে দেওয়াই শ্রেয়, অন্তত রিটায়রমেন্ট পর্যন্ত। যে কোনও বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তার পেনশন বিপন্ন করতে পারে। তাই মনস্থির করেছে এই মামলাটা ধীরে খেলবে।

সন্ধ্যার আকাশে তখন শেষ আলোর রেখা। হালকা হাওয়ায় শরীরটা জুড়িয়ে দিল। দাদার কথা মনে পড়ল। তার বন্ধু, দ্রষ্টা ও পথ প্রদর্শক। একটা চিনচিনে ব্যথা আজও বুকের মধ্যে। আজও ওর অভাব অনুভব করে। ও নিশ্চয়ই আকাশে কোনও একটা তারা হয়ে আছে। তাকাল তারায় খচিত আকাশের দিকে। মনে হচ্ছে যেন দাদা কথা বলছে ওর সঙ্গে। মেঘের রাশি ঢেকে দিল তারাদের। কালবৈশাখী আসতে পারে। পশ্চিমে বাতাস ওর প্রাণে শান্তির আমেজ ছড়িয়ে দিল।

***

অস্মিতার ইচ্ছে ছিল না অখিলেশ সোনিকে ফোন করে। কিন্তু অধীর বিশ্বাসের ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

সৌরিক নিশ্চয়ই কোনও কারণে খোঁজ নিতে বলেছে। সেই কারণটা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছে। ইতস্তত পুরনো কথা মনে পড়ছে। লোকটা কখন যে কী বলে বসবে কোনও ঠিক নেই। এই সব লোকেদের কাছে বয়সটা কোনও ব্যাপারই নয়। এখন মা নেই। কে ওকে সামলাবে? আরেকবার বুঝতে পারছে, মা কেমন ঢাল হয়ে রক্ষা করত এসব জোঁকদের থেকে। মা ওদের নিয়েই কাজ করত। তাই জানত ওদের কীভাবে বাগে রাখতে হয়। বুঝতে পারেনি মা কী করে অখিলেশের সঙ্গে বোঝাপড়া করত। তবে কিছু একটা সমঝোতা নিশ্চয়ই হয়েছিল। না-হলে এক সঙ্গে কাজ করছিল কী করে।

ও ফোন করল ‘‘ভুল সময় ফোন করলাম?’’

‘‘ঘরবন্দি। ঘুমের সময় ছাড়া সব সময়ই ঠিক’’

‘‘কোনও অধীর বিশ্বাসকে চেনেন?’’

‘‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনি। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অঘোষিত ডন। কেন?’’

‘‘সৌরিক জানতে চাইছে। বোধহয় কোনও লিংক পেয়েছে’’

‘‘ওকে বলে দিও এই লোকটাকে বেশি না ঘাঁটাতে। ওর প্রচুর পলিটিক্যাল লিংক। ওর পক্ষে কাউকে সরিয়ে ফেলটা বাঁ হাতের খেল’’

‘‘ওকে জানিয়ে দেব। মায়ের সঙ্গে ওর কেমন সম্পর্ক ছিল?’’

‘‘ঠিক জানি না। তবে শুনেছিলাম কিছু নিয়ে টানাপোড়েন চলছে’’

‘‘মা জানত না ও এই ধরনের?’’

‘‘জানত। আমাদের সকলের মতোই। আমরা সহজে ওকে ঘাঁটাই না’’

‘‘মা তা হলে ওর সঙ্গে কেন ঝামেলায় জড়াল?’’

‘‘ঐশিকা চিরকালই স্পষ্টবক্তা। ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের গুরুত্ব জানত। মেপে নিত, সে তার উপযুক্ত টাকা, শ্রদ্ধা পাচ্ছে কি না। কাজের জায়গাতে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে কেউ কিছু করাতে গেলে সেট থেকে বেরিয়ে যেত। ডিরেক্টররাও জানত। তাই সব সময়ই সচেতন ওর ব্যাপারে’’

মা যে অত্যন্ত জেদি তা অস্মিতার থেকে ভালো আর কে জানে। একা হাতে যুদ্ধ করে নিজের জায়গা করে নিয়েছিল টলিউডে। বিয়ে না করে বাচ্চাও দত্তক নিয়েছিল। নিজের বিশ্বাসে অটুট, স্পষ্ট কথা বলে দিত। অস্মিতা যদি কখনও বিপাকে পড়েছে, ওকে ঢালের মতো আগলে রাখত। নিজের মেয়ে না হওয়া সত্ত্বেও ওর সুরক্ষা, ভালো থাকার ব্যাপারে যে কোনও সাধারণ বাবা মায়ের থেকেও বেশি সতর্ক। মায়ের বেপরোয়া, সহজাত সাহসী মনোভাব কখনও নিজের নীতি সমর্থনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। নিশ্চয়ই সারা জীবনে প্রচুর শত্রু বাড়িয়েছে। কখনও কেয়ার করেনি। এটাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অস্মিতা মায়ের গোপন কথা জানে না। তবে এটাও জানে তার কোনও কমতি ছিল না।

সেগুলোর মধ্যে থেকেও কোনও কিছু এই খুনের জন্য দায়ী থাকতে পারে। শুধু সৌরিক যেগুলো অ্যাকাউন্ট আর মেল থেকে বার করেছে তা-ই নয়। অস্মিতা মায়ের ভালো-মন্দ দিকগুলো খুব স্পষ্ট জানে। তার মধ্যেও মাকে ভালোবাসত। আরাধনা করত এক্সক্লুসিভিটির প্রতিলিপি হিসেবে। কখনও কল্পনা করতে পারেনি যে এর জন্যে তাঁর মৃত্যু হতে পারে।

মনে পড়ে গেল মায়ের সঙ্গে হরিদ্বার, লছমনঝোলা, ঋষিকেশ বেড়াতে যাওয়ার কথা। দেবস্থান! দেব প্রয়াগে দুরন্ত অলকানন্দা শান্ত ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে স্রোতস্বিনী গঙ্গার রূপ নিয়েছে শান্ত সমতলে। হরিদ্বারে পৌঁছে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা দিয়ে রাজকীয় চালে তার প্রবাহ। ভারতের ইতিহাসে অনেক সভ্যতা, অনেক শহর বিকাশের কেন্দ্র।

হরিহর রূপে ঈশ্বরের একাত্মতার পরিচয় হরিদ্বার। আঞ্চলিক মতে হরদোয়ার বা শিবের দরজা। গঙ্গাকে যদি হিন্দু জীবনের মূল শরীর মনে করা যায়, বাঙালির হরিদ্বার তা হলে সেই দেবলোকের মুখ। হরি মানে বিষ্ণু, দ্বার মানে প্রবেশপথ। সত্যিই হরিদ্বার ভগবান বিষ্ণুর দেবালয়ের পথ। শত-সহস্র লোক এখানে আসে মোক্ষলাভের আশায়, সব পাপ এই পুণ্যজলে ধুতে। আসে শান্তি, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্তর জন্য।

মায়ের সঙ্গে টাঙায় চড়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াত ছোট্ট অস্মিতা। ধর্মপাঠও শুনত। প্রার্থনা, ধ্যান করত যোগ কেন্দ্রে। মা ওকে আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাদ দিতে চেয়েছিল।

একটা অদ্ভুত ঘটনা মনে পড়ে গেল। এমনই এক অলস বিকেলে মায়ের সঙ্গে গঙ্গার ধারে বসেছিল। চোখে পড়ল মা এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন এক সাধুর দিকে। খালি গা, গেরুয়া ধুতিতে গভীর ধ্যানে। পাশে অনেকগুলো বই। লক্ষ করল একটা একটা করে বইয়ের পাতা ছিড়ে নদীতে ফেলে দিচ্ছেন। অদ্ভুত! মা অসাড় ওঁর দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণ পর মন্ত্রমুগ্ধের মতো হেঁটে গেলেন সাধুর দিকে। অস্মিতাও সঙ্গে। দেখল সবই ধর্মগ্রন্থ। মা অবাক তাকিয়ে। ভাবছেন কী করতে চাইছেন সাধু। অল্প সময় পরে সাধু নদীতে সব বই বিসর্জন দিয়ে উঠে হনহন করে হাঁটা দিলেন। অবাক অস্মিতা দেখে, মা-ও তাঁর পেছন পেছন চলেছেন। পাছে মা রেগে যান সেই ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

পরে আন্দাজ করেছিল, সাধু ওই ধর্মগ্রন্থ জলে ফেলে দিয়ে গোঁড়া মতামত ত্যাগ করলেন। ঠিক মায়ের সামাজিক গোঁড়ামিগুলো ত্যাগ করার মতো। পারেনি বলেই বাস্তবের চাহিদায় এই সমমনোভাবাপন্ন সাধুর প্রতি আকর্ষণ। অবচেতনে চাওয়া আর বাস্তবের মধ্যে টানাপোড়েনে হয়ত মানসিক তোলপাড়। হতে পারে অতীতের কোনও অনুভূতির পরিণাম। কেউ নেই অস্মিতাকে সে কথা বলার। পরিবার ছাড়া পালক মাতৃত্বের খামতি।

“আপনার কি মনে হয় মায়ের ঔদ্ধত্য অধীর বিশ্বাসের সঙ্গে গন্ডগোলের কারণ?”

‘‘জানি না। হতেও পারে’’

‘‘মৃত্যু পর্যন্ত?’’

‘‘ওটা বাড়াবাড়ি। নির্ভর করে অধীরবাবু কতটা যাঁতাকলে। ওর অনেক গুন্ডা আছে, পলিটিক্যাল মাথাও। তাই ছাড় পাওয়াটা অসুবিধার নয়। যদিও আমার মনে হয় ওটা চরম। গন্ডগোলটা আদৌ কী সে পর্যায় পৌঁছেছিল? উদ্দেশ্যর ওপর নির্ভরশীল’’

‘‘উদ্দেশ্যটা বার করত পারবেন? এখন মা নেই। আমিও কাউকে তেমন চিনি না’’

‘‘চেষ্টা করব, কিন্তু কথা দিতে পারছি না। অধীর বিশ্বাস তোমার মায়ের খুনের সঙ্গে জড়িত কি না আমাকে খুঁজে বার করতে বল না। আমাকেও তো ইন্ডাস্ট্রিতে টিকে থাকতে হবে’’

‘‘না না। কথা দিচ্ছি বলব না। কারণটা জানতে পারলেই যথেষ্ট। আমি অন্তত নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব, মা নিজের অহঙ্কারের দাম দিয়েছে’’

‘‘দেখব’’

‘‘প্লিজ আপনার ব্যাংক ডিটেলস হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন। সৌরিক কনফার্ম করেছে আপনি টাকা ট্র্যান্সফার করেছিলেন। যদিও আমার কাছে কনট্র্যাক্টের কোনও কপি নেই’’

‘‘ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার ই-মেল অ্যাড্রেসটা আমাকে টেক্সট করে দাও’’

‘‘আপনার টাকা ট্রান্সফার করে দেব’’

‘‘ধন্যবাদ। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে জানি না কবে শুটিং শুরু করতে পারব। টাকার টানাটানির মধ্যেও অন্তত যে প্রজেক্টগুলো চালু আছে সেগুলো তো শেষ করতে হবে’’

অখিলেশ ফোনটা রেখে দিল। ওর সাহায্য ছাড়া ও বা সৌরিক, কেউই উদঘাটন করতে পারবে না ঐশিকা আর অধীর বিশ্বাসের মধ্যে কীসের সংঘর্ষ। একমাত্র তা হলেই বুঝতে পারবে অধীর বিশ্বাস খুন পর্যন্ত এগোবে কি না। তত দিন পর্যন্ত তাকে সন্দেহের তালিকায় ফেলা যাবে না, যতই কুখ্যাতি থাকুক।

অস্মিতা অখিলেশের সঙ্গে কথা বলে একটু হালকা বোধ করছে। এক কাপ চা নিয়ে টিভি চালিয়ে করোনা আপডেট দেখতে বসল। বিশেষ করে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ স্কিম, যেটা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন গতকালের স্পিচে।

***

সময় হয়েছে মেপে দেখার ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে। সৌরিক বার ক্যাবিনেট থেকে একটা লাফ্রয়েগের বোতল বার করল। গ্লাসে কয়েকটা বরফ ফেলল। ককটেল সসেজগুলো মাইক্রোওয়েভে গরম করে এসি চালিয়ে দিল। আজ খুব গুমোট গরম। নিশ্চিন্তে বসে পরখ করতে চায় কী কী তথ্য পেয়েছে।

এই মেল করা লোকটা বা অ্যাকাউন্টে ট্র্যানজ্যাকশন করা লোক ছাড়াও তো অনেকে থাকতে পারে সন্দেহের তালিকায়। তা হলে কী শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে এদের পেছনে পড়ে থেকে। ঐশিকার মোবাইল ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ওর অন্যান্য কন্ট্যাক্টসের খোঁজ করার।

অগ্নিদেবকে ফোন ‘‘মায়ের মোবাইলটা দেননি তো’’

‘‘ওটা দিতে পারব না। ওটা পুলিশ এভিডেন্স হিসেবে তোলা হয়েছে ক্রাইম সিন থেকে। আর যা কিছু পেয়েছি ফ্ল্যাট থেকে, সমস্ত একসঙ্গে আছে’’

‘‘ওনার কল ডিটেলস দেখেছেন?’’

‘‘না। সময় হয়নি’’

‘‘আর কল লগ?’’

‘‘তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি না?’’

‘‘না, পাঠাননি’’

‘‘এখনই মেল করে দিচ্ছি’’

অগ্নিদেব সবে ফিরেছে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটনির পর। এখন উদগ্রীব মল্ট নিয়ে বসার জন্য। ঐশিকার খুন নিয়ে সারা সন্ধে বরবাদ করতে চায় না। সৌরিককে মেল করে সান্ধ্য আসরের জন্য তৈরি হল।

সৌরিক ওর ম্যাকবুক প্রো খুলে পিডিএফ ফাইলটা ডাউনলোড করে ভালো করে স্ক্যান করল ঐশিকার কল-লগ। মারা যাবার আগে মা মোট চারটে কল পেয়েছিল। প্রথমটা অস্মিতা, দ্বিতীয়টা প্রাঞ্জল, তার পরেরটা রাস্তগি এবং শেষ কল অধীর বিশ্বাস। সৌরিক অগ্নিদেবের পাঠানো ময়না তদন্তের রিপোর্টটা খুলে মৃত্যুর সময়টা কল লগ- এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। সবচেয়ে কাছের কলটা অধীর বিশ্বাসের। সৌরিক কল-লগ স্ক্রোল করতে লাগল। আর কারা ফোন করেছিল। বেশিরভাগই দীপঙ্কর আর অস্মিতার, কিছু প্রাঞ্জল, এক-আধটা রায়তি। কোনওটাই অবাক করার মতো নয়। এটা স্পষ্ট যে, মা অস্মিতা আর দীপঙ্কর আঙ্কলের খুব কাছের। একদিন দীপঙ্কর আঙ্কলের সঙ্গে কথা বলতে হবে অস্মিতাকে কনফারেন্সে নিয়ে।

দূরে চাঁদের আলোয় আলোকিত রাতের আকাশের দিকে তাকাল সৌরিক। মল্টে চুমুক, উদাসীন। বিশাল এক ওড়না কামার্ত লিপ্সাময়ী নারীর মতো ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে চুম্বন এঁকে দিচ্ছে আকাশের সান্ধ্য ললাটে। আহ্বান জানাচ্ছে আবছায়া আঁধারের মায়াবী আলোয় ডুব দিতে। বেআব্রু আকাশের রূপে বিস্মিত, বিচলিত। ডুবে যাচ্ছে তার রসপূর্ণ মাদকতার লীলায়। গুপ্ত রহস্যের নগ্ন নারীরূপ ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে।

সৌরিক বিহ্বল করা পরিবেশে সত্যটা প্রস্ফুটিত হওয়ার প্রতীক্ষায়। যেন গেরুয়া পরিহিত গৌতম বুদ্ধ কালপুরুষ থেকে নেমে এসেছেন তাঁর শ্রাবস্তী আকাশে, নিজের বোধি পুনরুদ্ধার করতে এই ঘাঁটা রহস্যের মিলনযজ্ঞে।

অখিলেশ সোনি খুনি হতে পারে না। তার সঙ্গে ঐশিকার শুধুই ব্যবসায়িক সম্পর্ক। ঐশিকার তূর্য নিনাদ সময়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ করেছে। তাই সোনি তাঁকে পাঁচ লাখ টাকা অগ্রিম দিতে দ্বিধা করেনি। ওঁর মৃত্যুতে সোনির বড় ক্ষতি। খুনি পর্যন্ত পৌঁছনোর একটা রাস্তা হতে পারে। যতক্ষণ না অস্মিতা ডিটেলস দেয় ততক্ষণ ওর ভূমিকা অবান্তর।

সন্দেহের তালিকা তৈরি হওয়ার আগেই অখিলেশের নাম বেরিয়ে গেল তালিকা থেকে! বাকি রইল চার - অধীর বিশ্বাস, রাস্তগি, প্রাঞ্জল আর রায়তি। মনে হয় না শেষের দুজনের দ্বারা খুন করা সম্ভব। ওরা কোনওভাবেই অস্ট্রিয়ান জি-লক ২২ পিস্তল জোগাড় করতে পারবে না। সাহসও পাবে না। বড় জোর প্রথম দুজনের সহযোগী হতে পারে। বিশেষ করে রাস্তগির। ওদের ঠিক কী ভূমিকা সেটা জানতে হবে।

সৌরিকের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এই সীমিত অবস্থায় রাস্তগি আর অধীরের কাছ থেকে সত্যিটা বার করা। অস্মিতা অধীরের সঙ্গে মায়ের অবস্থানটা না জানানো পর্যন্ত এগোতে পারছে না। আর রাস্তগি...

প্রাঞ্জল আর রায়তির কাছ থেকে যা বার করার রাস্তগির সঙ্গে কথা বলার আগেই করতে হবে। নিদেনপক্ষে ওই কনট্র্যাক্টটা একবার দেখতে হবে যদি আদৌ তেমন কিছু থাকে ওর মধ্যে। সেটা হয়ত খুনের উদ্দেশ্যর ওপর আলোকপাত করলেও করতে পারে। অধীর যখন মাকে মেল করেছিল *‘টাকা দিয়ে দিন তা না হলে আপনার অ্যাক্টিং কেরিয়ার শেষ’*, তখন কোন পেমেন্ট চাইছিল?

এই গাঢ় অন্ধকারের শেষে যেন একটা আলোকবিন্দু দেখা যাচ্ছে। ওদের দুজনকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করবে, মাথায় রাখতে হবে ওদের উদ্দেশ্যটা কী আর ওদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে এমন একটা কাজ করা সম্ভব কি না। ধরেই নিচ্ছে ওদের দুজনেরই গুন্ডা আছে। যারা এই কাজটা নিপুণভাবে করতে পারে। কমপ্লেক্সের কাঠামোটা আরেকবার পর্যালোচনা প্রয়োজন। অন্য কোথাও থেকেও ওই কমপ্লেক্সে ঢোকার সুবিধা ছিল কি না। কোনও বাসিন্দারও সহযোগিতাও থাকতে পারে। কিন্তু এমন কে করবে? এমন কেউ যাকে অনেক অর্থ দিয়ে কিনে নেওয়া যায়, যার নিজস্ব রাগ ছিল মায়ের ওপর। অর্থবান অধীর আর রাস্তগি, দুজনেরই ওরকম টাকা ছড়ানো সম্ভব। কিন্তু এখন অমন কাউকে ছেঁকে বার করবে কী করে?

মল্ট কাজ করতে শুরু করেছে। চিন্তাশক্তি অবশ হওয়ার আগেই রায়তির কাছ থেকে কী করে খবর বার করা যায়, ছকে নিতে হবে। প্রাঞ্জল নিজেকে মধ্যবিত্ত চাকুরে হিসেবে দেখাতে চাইলেও, ভীষণ

ধূর্ত। ওকে যদি কব্জা করা না যায়, সৌরিককে সারা দুনিয়া চষিয়ে বেড়াবে। ওকে যদি সত্যি ঘটনা দিয়ে কায়দা করা যায়, তবেই ওর কাছ থেকে আরও ডিটেলস পাওয়া যাবে।

আপাতত রায়তিই ভরসা।

***

বোঝাই যাচ্ছে ধূর্ত প্রাঞ্জল সত্যি কথাটা বলবে না... কারণটা অবশ্য অজানা। আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না, লোকটি বিশেষ সুবিধার নয়। সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে লোকটি এই খুনের সঙ্গে জড়িত। ওর স্পেশাল বান্ধবী রায়তিও বলবে না। একটাই উপায়, ভেবেচিন্তে এমন একটা অনুমান দাঁড় করাতে হবে, যেটা রায়তি স্বীকার করে নেবে।

কল লগ থেকে এটা পরিষ্কার, প্রাঞ্জল বহু বার ঐশিকাকে ফোন করেছিল। খুব সম্ভবত রাস্তগির সঙ্গে ডিলটা ঠিক করছিল।

সৌরিক একটা চাল ঠিক করে রায়তিকে ভিডিও কল করল ‘‘অনেক ধন্যবাদ। খুব ভালো লাগল প্রাঞ্জল বাগচির সঙ্গে কথা বলে। যে ডিলটা ঐশিকার সঙ্গে হয়েছিল সেটা ওনার হাতের কাছে ছিল না। আপনার কাছে আছে?’’

‘‘হ্যাঁ আছে। আসলে প্রাঞ্জল খুব একটা টেক স্যাভি নয়। পাঠিয়ে দিচ্ছি’’

কয়েক সেকেন্ডে পিডিএফ ফাইলটা এসে গেল। সৌরিক ডাউনলোড করে রাখল সযত্নে। তা হলে কনট্র্যাক্ট একটা হয়েছিল, যা প্রাঞ্জল চেপে গেছে।

‘‘আপনারা দুজনে বেশ বন্ধু’’ সৌরিক হাওয়ায় কথাটা ছেড়ে দিল।

‘‘হ্যাঁ, ভীষণ। একই পাড়ায় তো থাকি’’

‘‘এই ডিল থেকে আপনার কত লাভ হয়েছে?’’ সৌরিক ভয় ভয় আন্দাজে ঢিল ছুড়ল। পাছে না আবার উল্টে বিপদে পড়ে, তবে পরেনি!

‘‘পাঁচ লাখ’’

‘‘আর প্রাঞ্জল?’’

‘‘ও কিছুই পায়নি। ঐশিকা ম্যামের দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ...’’

‘‘তার মানে ওর পাওনাটা পায়নি। তা হলে আপনাকে টাকা দিল কী করে?’’

‘‘রাস্তগি যে টাকা দিয়েছিল, তার থেকে’’

‘‘সেখানে আপনার কী ভূমিকা?

‘‘আমারই তো মুখ্য ভূমিকা। আমিই তো ম্যামকে রাজি করাই এই কনট্র্যাক্টে। বলেছিলাম না, ম্যাম আমাকে খুব পছন্দ করতেন। আমার কথা শুনতেন, প্রাঞ্জলের নয়’’

‘‘তা হলে তো আপনার মেন শেয়ার পাওয়া উচিত’’

“রাস্তগির জন্য প্রাঞ্জল কাজ করে, আমি না”

“রাস্তগি কি পুরো টাকাটা দিয়েছিল?” অন্ধকারে কোপ মারল সৌরিক।

“ওর তো কিছু করার ছিল না। ও আটকে গেছিল। আমিই উদ্ধার করি”

“আপনি ম্যামের এত কাছের অথচ কোনও দিন দেখা হয়নি” সৌরিকের একটু হালকা হওয়ার চেষ্টা।

“আপনি ছিলেন না যখন অস্মিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল”

“আচ্ছা, রাস্তগি লোকটা কেমন? ভালো?”

“কোনও দিন দেখিনি। প্রাঞ্জলের কাছেই অনেক কথা শুনেছি। খুব দাপুটে প্রমোটার। কখনও ‘না’ শোনে না। তাতেই যত ঝামেলা। ঐশিকা ম্যাম ওনার হরীশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা দিতে ‘না’ করে দিয়েছিলেন। ম্যাম একদম জেদ ধরে বসেছিলেন। কিছুতেই প্রমোশনের জন্য রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ওই ডিলে রাজি না হয়ে আর কোনও উপায় ছিল না”

“৪০% প্রমোশনের শেয়ার?”

“দেখুন কনট্র্যাক্টে” সৌরিক কথা বলতে বলতে কনট্র্যাক্টটায় চোখ বুলিয়ে নিল।

“ঠিক তাই। এতে ওর বিরাট ক্ষতি। সামাল দেওয়া মুশকিল। জানেন তো এসব প্রমোটারদের”

“আপনার কী মনে হয় ও মাকে খুন করেছে?”

“বলতে পারব না। ওদের তো গুন্ডা থাকে। কত দূর যেতে পারে ঈশ্বরই জানেন। ওর যে প্রচুর ক্ষতি হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই”

“আপনার মার্কেটিংয়ে থাকা উচিত ছিল, বুটিকে নয়”

“যদি আরেকটু পড়াশোনা থাকত। ডিগ্রি ছাড়া তো সম্ভব নয়”

“কদ্দুর পড়াশোনা করেছেন?”

“সেকেন্ডারি পাস”

সৌরিক বুঝল, কেন ওকে দ্বিচারিতা করতে হয়। বর্তমান আর্থিক অনটনের সময় বাংলার বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এভাবেই নিজেদের সংসার চালাচ্ছে। তারপর যদি দেখতে শুনতে ভালো হয়, তা হলে কোনও অসুবিধাই নেই। পড়াশোনা বেশি থাকলে একটা এটিকেট অনায়াসেই জন্ম নেয় দর বাড়াতে। কনভেন্ট এডুকেশন হলে তো পোয়া বারো!

রায়তির পড়াশোনা বা কনভেন্ট এডুকেশন বাদ দিলেও মন্দ নয়। লকডাউনের আগে ও নিশ্চয় এই ব্যবসায় ছিল। এখন প্রশ্ন হল, প্রাঞ্জল কি ওর নিয়মিত খদ্দের? খুব সম্ভব, হ্যাঁ। বোধহয় ওর কাছ থেকেই রায়তির সবথেকে বেশি মাসিক কামাই। ওই টাকা থেকেই ওর পোশাক, প্রসাধনীর খরচ। সহজ ব্যবস্থা। পাশের বাড়ি, যাতায়াতের ঝামেলা নেই। ঘরে বসেই রোজগার।

“তা-ও মনে হয় সুযোগ পেলে আপনি মার্কেটিংয়ে বেশি সফল হতেন”

“আমাকে সুযোগ কে দেবে? আপনি?”

এক মুহূর্তের জন্য সৌরিক থমকে গেল। রায়তির কষ্টটা স্পষ্ট। স্ন্যাপচ্যাটের রায়তি যে সাইবার-সেক্স বেচে এই আর্থিক দুর্দিনে, আর বাস্তবের রায়তি পুরো বিপরীত! খুব খারাপ লাগছিল।

“লকডাউনের শেষে আমার কী হবে জানি না। এই মহামারী সব প্ল্যান গুলিয়ে দিয়েছে। সব যখন খুলবে, আবার নতুন করে ভাবতে হবে”

“আমারও একই দশা। জানি না চাকরিটা থাকবে কি না। আমার মতো বায়োডাটা হলে আরও সমস্যা”

“কিছু চিন্তা করেছেন?”

“আমার আর কী চিন্তা করার আছে? যা হাতে পাব তাই নিতে হবে। হাতে কিছু পাওয়া, সেটাও ধোঁয়াশায়। আপাতত কোভিড মাস্ক সাপ্লায়ার খুঁজছি। আমি বানিয়ে দিতে পারি। এখন মাস্ক বেশ কিছু দিন চলবে”

“আমি যদি কোনও খোঁজ পাই, জানাব”

“তা হলে খুব সুবিধা হয়। বাবার শরীরটাও তেমন ভালো যাচ্ছে না। মনে হয় না, লকডাউনের পরে আর কাজ করতে পারবে। আমার রোজগারেই সংসার চালাতে হবে। ম্যামকে খুব মিস করছি। খুন না হলে উনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতেন।”

ঐশিকার ওপর রায়তির ভরসা স্পষ্ট। ওর মৃত্যুতে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। প্রাঞ্জল বা রাস্তগির কথা বলা যায় না। কিন্তু রায়তি কোনও ভাবেই এই খুনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। সোনার ডিম পারা হাঁস কেউ মারে?

“খারাপ লাগছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করব খুনিকে ধরার” রায়তি আশ্বস্ত করল।

“ফোন করবেন। যদি কোনও সাহায্য করতে পারি”

“ভালো থাকবেন। সাবধানে থাকবেন। রাখছি”

সৌরিক ভুলে গেছে স্ন্যাপচ্যাটের ইরটিক নগ্ন চেহারা। ভুলে গেছে দুহাজার টাকা দিয়ে কেনা আধঘণ্টার ভয়ারিজম। মুছে ফেলতে চায় ওর নগ্ন শরীরের প্রলোভনদায়ী চেহারাটা। এখন ও আর মোটেও সেক্সি দেহপসারিণী নয়। ওর ভেতরের মানুষটাই সামনে ভাসছে। রায়তি যেন মনিমাণিক্য অলঙ্কারে ভূষিতা দেবী! ওর অবয়ব আকর্ষণ করে না, শুধুই ওর শুদ্ধ আত্মা! পোশাকে বেশি আকর্ষণীয়। ওর কথা, ওর নগ্নতাকে ঢেকে দিয়েছে এক শ্বেতশুভ্র আবরণে। যেখানে হতাশা উদ্দীপনার সঙ্গে আত্মার অক্ষয় রঙে মিশেছে।

সৌরিক এখন আত্মগ্লানি থেকে অনেকটাই মুক্ত। ঠিক গ্রীষ্মের স্বচ্ছ নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো মুক্ত বিহঙ্গের মতো।

***

পরের দিন অস্মিতা যখন ফোন করল, তখন সৌরিক স্নানে "অখিলেশ সোনি, অধীর বিশ্বাসের খবর বার করেছে"

"এক মিনিট। স্নান করছি। বেরিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে কল করছি"

বেরিয়ে টাওয়েল জড়িয়ে একটা ফ্রুট জুস নিয়ে কলব্যাক করল "বল, কী হয়েছে"

"অখিলেশ আজ ফোন করেছিল। বিশ্বাস করতে পারবে না কী উদ্ধার করেছে। অধীর বিশ্বাস টলিউডের বিগ ডন। গুন্ডা তো আছেই, হাই লেভেল পলিটিক্যাল কন্টাক্টসও। টলিউডে 'সিন্ডিকেট' চালায়। যারা ওখানে কাজ করতে চায় তাদের থেকে মাসিক তোলাবাজি করে। মা দিতে রাজি হয়নি"

সৌরিকের মনে পড়ে গেল মেলটার কথা 'টাকা দিয়ে দিন না হলে অ্যাক্টিং কারিয়ার শেষ'

খোলা হুমকি! কী হল মাঝখানে?

"মা আগে তোলা দিচ্ছিল?"

"হ্যাঁ। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেন"

"কোনও কারণ আছে?"

"মা যেহেতু সিনিয়ার অ্যাক্টর, তাই তাঁর ফিস বাড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, মা আর ক'জনের সঙ্গে মিলে একটা গ্রুপ তৈরি করেছিল। বাকি অ্যাক্টরদের টাকা দিতে বারণ করছিল"

"এ তো খোদ সিন্ডিকেটকে হুমকি! কোনও আইডিয়া আছে কোন গ্রুপে ঐশিকা যোগ দিয়েছিল?"

"পরিষ্কার করে ঠিক বলতে পারেনি। কী একটা বামপন্থী জঙ্গিগোষ্ঠী। ওর সিন্ডিকেটের থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল"

"মা কখনও কী পলিটিক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিল?"

"ঠিক জানা নেই। মা এত রোজগার করত। অধীর বিশ্বাস সেটারই সুবিধা নিতে চাইছিল। মা কিন্তু গ্রুপে প্রচুর লোক জোগাড় করে ফেলেছিল"

"একটা বিপরীত গোষ্ঠী তৈরি করে"

"একদম। বাংলায় সূক্ষ্ম বদলের হওয়া বইছে। তাই অন্যান্য পলিটিক্যাল গ্রুপগুলোও মাকে সমর্থন করেছে"

"বুঝলাম। তার মানে মা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, টলিউড থেকে বিশ্বাসকে উৎখাত করে দিতে পারত"

‘‘সেই সঙ্গে বেআইনি রোজগার। সোনি আরও বলেছে যে, বিশ্বাস সাপ্লায়ারদের কাছ থেকেও মোটা কমিশন নেয়। কেউ আপত্তি করলেই তাকে বার করে দেয়’’

এ এক ঐশিকার অন্য রূপ যা ওরা কেউই জানত না। সৌরিকের ধারণা, ঐশিকা টলিউডে শুধুই নিজেরর কাজ নিয়ে থাকত। খুব কমই পার্টিতে যেত। অস্মিতার কাছ থেকে শুনেছে, কাজের বাইরে, অবসর সময় হয় অস্মিতার সঙ্গে নয়তো দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে কাটত। এখন বুঝতে পারছে, ঐশিকার কর্মক্ষেত্রে একটা অলক্ষিত দিক ছিল। এক ক্ষমতাশালী নেত্রী, যে প্রচলিত অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করছিল। কিন্তু কেন? ওঁর যা রোজগার আর সুনাম, তাতে নিশ্চিন্ত আরামে জীবন কাটাতে পারতেন। এমন প্রতিকূল মনোভাব এল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই ওঁর অতীতের সঙ্গে কোনও যোগ আছে। একজন প্রতিষ্ঠিত নায়িকা হঠাৎ কেন একটা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবেন? ওঁর কী ভয় ছিল না, ইন্ডাস্ট্রি থেকে বার করে দিতে পারে?

এই সাহস পেয়েছেন হয় কাজের মাধ্যমে নয়তো অতীতের যোগাযোগের জন্য। যা অধীর বিশ্বাস ছুঁতে পারেনি। তাই ওই হুমকির মেল! যদি পারত ঐশিকা রায়কে ইন্ডাস্ট্রি থেকে বার করে দিত। ঐশিকার কী এমন শক্তি যে অধীরের ব্যবসায় ছাই ফেলেছিল? খুঁজে বার করতেই হবে।

‘‘অখিলেশ কী বলছে?’’

‘‘জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল এই গ্রুপটার কথা ও জানে না। একটা কারণ হতে পারে, চামুণ্ডেশ্বরী যেহেতু বাংলা সিনেমা, সিরিয়াল বা ওয়েব-সিরিসের সবচেয়ে বড় প্রোডিউসার তাই হয়ত অধীরকে খুশি রাখতে মরিয়া। আবার এমনও হতে পারে, এই গ্রুপের কাজকর্ম অখিলেশের থেকে ওরা দূরে রেখেছিল’’

‘‘হতেই পারে, ওরা মনে করত, অখিলেশ অধীরের দলে’’

‘‘এতগুলো প্রোডাকশন চালু, এমন অবস্থায় ওরা ধরেই নিয়েছিল অখিলেশ ওদের বিরোধী দলের সঙ্গে থাকতে পারে না। তাই ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল’’

এই যদি হয়, তাহলে অধীরের যথেষ্ট কারণ আছে ঐশিকাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলার। হাতে যথেষ্ট সংখ্যক গুন্ডা, পলিটিক্যাল যোগাযোগ। ও তো অনায়াসেই ঐশিকার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে, ওকে খুন করে বেরিয়ে যেতে পারে। এই লকডাউনের মধ্যে কোনও ব্যাপারই নয়। কারও চোখে পড়বে না। সমস্ত বাসিন্দাই বাড়ির ভেতরে। তাই সার্ভেলেন্সও হালকা। খুনের জন্য সুবর্ণ সুযোগ এই করোনা মহামারীতে! উদ্দেশ্য স্পষ্ট!

‘‘জানি না এর থেকে বেশি আর কী পাওয়া যাবে অধীরের কাছ থেকে। মানে, যা জানি তার ওপরে। ও তো আর খুনের কথা স্বীকার করবে না। তা-ও একবার কথা বলে দেখি। কথার ফাঁকে কিছু ধরতে পারি কি না’’

‘‘দীপঙ্কর আঙ্কলের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। মায়ের অতীতের কিছু বিশদে জানাতে পারে’’

‘‘হ্যাঁ, আমারও মনে হয় সেটাই একমাত্র উপায়। থ্যাঙ্কস। আজকের রান্না হয়ে গেছে?’’ সৌরিক জিজ্ঞেস করল।

‘‘গতকাল করেছি। এখন খোলা মনে অনলাইন কাজে বসব’’

‘‘আমাকেও অনলাইন লিয়াজঁ শুরু করতে হবে। মাথায় কিছু নতুন আইডিয়া এসেছে। এই প্যানডেমিকের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। এই তদন্তের খাঁড়া মাথার ওপর। তাই ফোকাস করতে পারছি না’’

‘‘তোমার তো অপশন আছে। আমার কোনও উপায় নেই, চাকরি করি যে। ফেরার আগে এই রিপোর্টটা শেষ করতে হবে। নাও, ভালো থেক। রাখছি’’

চ্যাটের পর সৌরিক ঠান্ডআ মাথায় বসে চিন্তা করতে লাগল আলোচনা নিয়ে। অধীর বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলার আগে অগ্নিদেবের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। এই ধরনের লোকেরা ভয়ঙ্কর হয়! ওর প্রাণ সংশয় হতে পারে।

***

তা হলে প্রাঞ্জল মিথ্যে বলেছে। প্রাঞ্জলের সঙ্গে কনট্রাক্ট নিয়ে কথোপকথন মনে পড়ে গেল ‘*শুধু মৌখিক, লিখিত কিছু নয়*’ কথাটা লুকানো কেন, বোঝা মুশকিল।

সৌরিক আন্দাজ করেছিল কোর্ট পেপারে ডিলটা নথিভুক্ত করা হয়েছে। অগ্নিদেবের সঙ্গে কথা বলার পর এটাও আন্দাজ করেছে, ঐশিকা রাস্তগির সঙ্গে হরীশ মুখার্জি রোডের পৈতৃক বাড়িটা নিয়েই ডিল করেছিল। রায়তির কাছ থেকে পাওয়ার পর কেবল চোখ বুলিয়েছে। এখন পুরোটা পড়ল। ওখানে পরিষ্কার লেখা, নাইটিঙ্গল এন্টারপ্রাইজকে অধিকার দিয়েছে প্রমোট করার জন্য। লাভের অংশ ৪০-৬০ ভাগ। অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রমোটার বা ডেভেলপারকে পুরো অধিকার দেওয়া হয় ডেভেলপ করে বিক্রি করার। বিনিময়ে বাড়ির মালিক পায় থোক টাকা, তার সঙ্গে ফ্ল্যাট। যত দিন বাড়ি তৈরি না হয়, বাড়ির মালিককে থাকার উপযুক্ত বাসস্থান দিতে হয়।

এই ডিলটাতে রাস্তগির প্রচুর লোকসান হয়েছে। ঐশিকার কথা না মেনে ওর আর কিছুই করার ছিল না। এটার জন্যও প্রাঞ্জল বা রায়তিকে নিযুক্ত করতে হয় ঐশিকাকে রাজি করাতে। না হলে ঐশিকার কোনও ইচ্ছেই ছিল না ওই বাড়ি বিক্রির। শেষ পর্যন্ত রাজি হয় রায়তির কথায়। সেখানেও রাস্তগিকে ভালো রকম কমিশন দিতে হয় প্রাঞ্জলকে, রায়তিকে দিয়ে রাজি করাতে। প্রচণ্ড ক্ষতি হয় ডিলে। ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ যথেষ্ট। উদ্দেশ্যটাও যুক্তি সংগত।

রাস্তগির খুন করার উদ্দেশ্যটা দৃঢ়। সৌরিক বুঝল ঝানু লোকের সঙ্গে কথা হতে চলেছে।

‘‘নমস্কার, আমি সৌরিক চ্যাটার্জি, ঐশিকা রায়ের মেয়ে অস্মিতার স্বামী’’

‘‘পালিতা কন্যা’’ রাস্তগি সংশোধন করে দিল।

‘‘হোয়াটসঅ্যাপে কল করতে পারি? মোবাইল কানেকশন এই লকডাউনে খুবই বিপর্যস্ত?’’

‘‘ঠিক আছে’’ রাস্তগি লাইন কেটে দিল।

সৌরিক ফিরে এল ভিডিও কলে ‘‘হ্যাঁ, এটা বেশ ভালো। আমাকে দেখতে পারছেন তো?’’

‘‘হ্যাঁ। কী ব্যাপার?’’

‘‘ঐশিকার সঙ্গে আপনার ডিলটা পড়ছিলাম। যেহেতু অস্মিতা এখন দিল্লিতে, আমিই ওর হয়ে ফোন করছি’’

‘‘কী করে জানব আপনি ওর স্বামী?’’

‘‘একটু দাঁড়ান। ওকেও লুপে নিয়ে নিই’’ সৌরিক অস্মিতাকে ফোন করল। ‘‘এই তো অস্মিতা। ওকে দেখতে পাচ্ছেন?’’

‘‘হ্যাঁ হ্যাঁ। বলুন, কী বলবেন’’

এবার সৌরিক ওকে ভালো করে দেখল। গোল চাঁদপানা মুখ, সরু গোঁফ, মাঝবয়সি, বেগুনি শার্টে যতখানি দেখা যায়, রাস্তগিকে একটু মোটাই মনে হল। নিজেকে সামলে নিল সৌরিক। সাবধানে এগোতে হবে। দ্বিতীয়বার কথা বলার সুযোগ না-ও মিলতে পারে। যতটা পারা যায় বার করে নিতে হবে।

‘‘আপনি মায়ের সঙ্গে একটা কনট্র্যাক্ট করেছিলেন ওনার হরীশ মুখার্জি রোডের পৈতৃক বাড়িটা নিয়ে। ওঁর অবর্তমানে আপনাকে অস্মিতার সঙ্গে কথা বলতে হবে। মা আপনাকে এক লাখ টাকার একটা অ্যাডভান্সও দিয়েছিলেন। আপনার প্রজেক্ট কত দূর?’’

‘‘দাঁড়াও দাঁড়াও, এত তাড়াহুড়ো কীসের? আমি উত্তর দেওয়ার আগে তো অস্মিতাকে উত্তরাধিকারের আইনি দলিল আদালতে পেশ করতে হবে’’

যা ভেবেছিল, পুরো ঝানু মাল! খুব ভালোই জানে এই লকডাউনের সময় কোর্ট-কাছারি সব বন্ধ। তার সুযোগ নিয়ে এই আইনি ফ্যাকরা। এই অনিশ্চয়তার সময় কেউই জানে না কবে সব খুলবে। এখন যেহেতু কোর্ট বন্ধ, কাজও জমছে। খুললেও কবে কার্যসিদ্ধি হবে জানা নেই। রাস্তগির এখন অনুকূল অবস্থান। ও যদি ঐশিকাকে খুন করেই থাকে, এই পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নেবে।

‘‘সে তো আমরা দিয়েই দেব’’

‘‘আগে দাও। তারপর কথা। তত দিন আমি একমাত্র অথরিটি’’

‘‘ওই এক লাখ অ্যাডভান্সের কী হবে?’’

‘‘ওটা ঐশিকা দিয়েছিল। উত্তরাধিকার প্রমাণ হলে সে নিয়ে কথা বলব’’

‘‘আমরা যদি এই ডিলটা নিয়ে না এগোতে চাই?’’

“তা হলে ইনজাংশন ফাইল করুন। শুধু কোর্টেই নিজের ইচ্ছা পেশ করা যায়। আর কিছু? তা হলে এই পর্যন্তই” বলেই, উত্তরের অপেক্ষা না করে লাইনটা কেটে দিল।

ওদের কিছুই করার নেই। কোর্টের অনিশ্চয়তার মধ্যে অসহায়। সৌরিকের আর সুযোগ নেই ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করার। ওর ইচ্ছা ছিল রাস্তগিকে মায়ের মৃত্যু প্রসঙ্গে টেনে আনতে। কিন্তু স্মার্টলি কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

“এখন কী হবে?” অস্মিতা জিজ্ঞেস করল।

“প্রাঞ্জল বাগচি। আমার একমাত্র রাস্তা”

“চালিয়ে যাও। অফিস থেকে আমার একটা ফোন আসছে... রাখছি”

সৌরিক রাস্তগির পেনাল্টি কিকে গোল খেয়ে গেছে। জানে প্রাঞ্জলও সহজ মাছ নয়। ওর কাছ থেকেও সত্যিটা বার করা সহজ হবে না। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

***

দীপঙ্কর কাকু ফোনে অস্মিতার অস্বস্তি বাড়িয়ে “তোমার কাছ থেকে একটা ফোন আশা করেছিলাম” গলায় বিরক্তির রেশ।

“ভুল হয়ে গেছে কাকু” ক্ষমা চেয়ে নিল অস্মিতা।

মায়ের হঠাৎ মৃত্যুতে অস্মিতা স্তম্ভিত। কাকুকে আর ফোন করা হয়নি খবরটা দেওয়ার পর। অসন্তুষ্ট হওয়ার সেটাও কারণ। ভেবেছিল সমস্ত কাজ মিটে যাওয়ার পর ফোন করবে। সৌরিকের সঙ্গে মৃত্যুর তদন্তে জড়িয়ে ভুলেই গেছিল। ওরা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। তাই হয়ত কাকুও আর ফোন করেননি।

“সরি কাকু। এত আচমকা হল যে সামলে উঠতে সময় লাগল। তুমিও তো ফোন করতে পারতে”

“আমারও একই অবস্থা। তোমার মাকে চিনি সেই কবে থেকে... তুমি ওর জীবনে আসার বহু আগে। যাক গে, কেমন আছ?”

“মায়ের শেষ কাজ দিল্লিতেই করেছি। অনেক কষ্টে পুরুত জোগাড় করে বাড়িতেই। এখন আর সবার মতো দিল্লিতেই আটকা, যদ্দিন না ফ্লাইট চালু হচ্ছে।”

“ওর মরা মুখ দেখতে চাইনি। তাই শ্মশানে যাইনি। শুনলাম, সৌরিকই সব করেছে”

“হ্যাঁ”

“খুনিকে ধরতে পেরেছে?”

“পুলিস এখন লকডাউন নিয়ে খুব ব্যস্ত, তাই সৌরিককেই দায়িত্ব দিয়েছে। ও ওটা নিয়ে কাজ করছে। শিগগিরিই তোমায় কল করবে দরকারি সাহায্যের জন্য”

“বুঝতেই পারছি না কে ওকে খুন করতে পারে... বিশেষ করে এমন কঠিন সময়ে। ও তো সবার থেকেই দূরে থাকত”

“কাকু, লাইন ক্র্যাক করছে। তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করি?”

“ঠিক আছে”

অস্মিতা হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করল “নেটে কল করা অনেক ভালো। ভোডাফোন এখন ধুঁকছে”

“এখন ঠিক আছে?”

“হ্যাঁ”

কাকুর ভারী চশমা পরা মুখটা ভেসে উঠল। ক’দিনের না কাটা দাড়ি। এই বয়েসেও সাংঘাতিক কমনীয়তা। আবছা মনে পড়ল ছোটবেলায় কাকুকে কেমন দেখতে ছিল। লম্বা দোহারা চেহারা, ভারী চশমা। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। সব মিলিয়ে যে কোনও মেয়েকে কাবু করতে পারে। না জানি যুবক অবস্থায় কেমন ছিল।

“আমরা একে অপরকে সেই কলেজ থেকে চিনি”

“কোনও দিন জিজ্ঞেস করিনি... তোমাদের কী প্রেম ছিল?”

“হ্যাঁ। সেই ও যখন প্রেসিডেন্সিতে। তারপর ইউনিভার্সিটি”

“তা হলে বিয়ে করনি কেন?”

“সে এক লম্বা গল্প। ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন ও পলিটিক্সে খুব জোরদার ভাবে জড়িয়ে পড়ে। নকশাল মুভমেন্ট তখন বাংলাকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। অন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মতোই ও ভেসে গেল সেই জোয়ারে। আমার পলিটিক্সে কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না। সেখান থেকেই ছাড়াছাড়ি। ঐশিকা তখন পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত। আর আমি পাস করে নিজের ব্যবসা দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি। একদম শূন্য থেকে শুরু করা তো। খুবই খাটুনি ছিল। তাই অবসর পেতাম না। দুজনের দেখাই হত না”

“তাও প্রেম ছিল?”

“হ্যাঁ, না থাকার তো কোনও কারণ ছিল না। দেখা নাই হোক, মন থেকে তো দূরে সরে যায়নি”

“মায়ের ক্ষেত্রেও তাই?”

“হ্যাঁ। অপারেশন স্টিপলচেসের জন্য যখন নকশাল মুভমেন্ট শেষের পথে, তখন সব নকশালদের হয় গুলি করে মারছে, নয়তো গ্রেফতার করছে, সেই সময়ে ও ঠিক করল সরে আসবে। তখন আবার পুরনো সম্পর্কে। এর মধ্যে জানতে পারলাম যে ওর ফাইব্রয়েড ইউটেরস থেকে প্রবল অনিয়ন্ত্রিত রক্তক্ষরণের জন্য ইমারজেন্সি হিস্ট্রেক্টমি অপারেশন করতে হয়েছিল”

“হিস্ট্রেক্টমি কী?”

“ইউটেরস বাদ দিয়ে দেওয়া। যার মানে ও আর কোনও দিন মা হতে পারবে না”

“নিশ্চয়ই মায়ের কাছে এটা খুব শকিং?”

“এটা যে কোনও মহিলার পক্ষেই মেনে নেওয়া খুব কষ্টের, বিশেষ করে ওই বয়সে। নকশাল মুভমেন্টটা মরে না গেলে আমার বিশ্বাস ও এখনও লেগে থাকত। কিন্তু ভগবান অতটা নির্দয় নন। হঠাৎ চান্স পেয়ে যায় একটা বাংলা সিনেমায়। একদম প্রথম ছবি থেকেই বাজিমাত! বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভাঙল। তারপর একটার পর একটা হিট। এরপর কতগুলো ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। ঐশিকা নিজের স্থায়ী জায়গা করে নিল টলিউডে”

“সেই কারণেই কী তোমরা বিয়ে করনি?”

“না। ও বিয়ে করত চায়নি। কারণ ও গর্ভধারণ করতে পারবে না। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। ওর পাশেই থাকতে চেয়েছিলাম বেবি ছাড়াই। ওর মনে হয়েছিল যোগ্য পিতৃত্ব থেকে আমায় বঞ্চিত করবে। জানই তো, কী প্রচণ্ড একগুঁয়ে। শেষ অবধি মানাতে পারিনি”

“সেখানেই আমি এলাম”

“ঠিক ধরেছ। ওর মাতৃসত্তা একটা আশ্রয় খুঁজছিল। তুমি তার সেই চাহিদা মেটালে। ওর সাফল্য বাড়তে লাগল। সঙ্গে আমার ব্যবসাও। সেই থেকে আমরা খুব ভালো বন্ধু”

“সব সময়ই মনে হত তোমাদের মধ্যে কোনও গভীর সম্পর্ক। কোনও দিন জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। ভালো লাগল তুমি আজ বললে”

“ও চলে গেছে। এখন আমি একা। এখন বুঝতে পারছ কেন চুপ ছিলাম। সয়ে নেওয়ার পক্ষে আমার জন্য এই শকটা খুবই বেশি”

জীবনের সায়াহ্নে সে এখন নিজেকে সঁপে দিয়েছে নিঃশব্দের ধুনে। সন্ধ্যা প্রদীপের আলো জ্বালাতে। ঐশিকা ছিল তার অন্তরের কনসার্টের চিরকালীন সুর। ওর অবর্তমানে এখন চিরস্থায়ী শূন্যতা।

কাকু যে বিয়ে করেনি, তার প্রমাণ মাকে সে কতটা ভালোবাসত। আকস্মিক সঙ্গী চলে যাওয়ায় শূন্যতা। বিবাহ বন্ধনের থেকে সখ্য অনেক বেশি গভীর।

“সরি কাকু। আমারই দোষ। তোমাকে ঠিক বুঝতে পারিনি”

“বরণ করি আমি তোমায়
আমার নিজের না পাওয়া
প্রদীপের পেছনে পড়ে থাকা
একান্ত নিভৃত অন্ধকারে।
তোমায় আমি গ্রহণ করি
আমার শেষ রাগিনীর
একাকী নিঃশব্দ ঝংকারে।

তুমি যেই হও না কেন তুমিই তো আমার পূজা।

তুমি যেই হও না কেন তুমিই আমার রাজা।

তুমি যেই হও না কেন তুমিই তো আমার তৃষা।

আমার একমাত্র সান্ত্বনায় দিশা”

অস্মিতা অনুভব করছে, ওদের দীর্ঘ দিনের প্রেম। মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটবেলার স্বপ্নে দেখা তারাটাকেঃ

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার

হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর

তার সঙ্গে কাকুর গভীর সান্নিধ্যের আনন্দ ঐকতান। আকাশের তারাগুলো আবার নিজেদের গুছিয়ে এক নতুন মালায়। নতুন তালে জীবনের নতুন দিশায়। ফ্রেস ক্যানভাসে ছদ্মবেশটা প্রলেপের মধ্যেও স্পষ্ট। নিঃশব্দ বিরতির মধ্যে স্বতন্ত্র নতুন উপভাষা খুঁজছে। তার উদ্বেল হৃদয়ে নতুন ঘনিষ্ঠতার আগামী শঙ্খনাদ। উষ্ণ চেতনায় অন্য অদেখা রাজ্যে অভিষিক্ত।

“সরি কাকু। বুঝিনি তুমি এত কাছের” কেঁদে ফেলল অস্মিতা।

“কখনও সরি বোল না। তুমিই ওর একমাত্র সম্পদ। আমাদের গভীর সংযোগ তোমার মধ্যে দিয়েই ওকে অনুভব করতে পারি। এখন তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়”

এতকাল যা ধোঁয়াশা ছিল এখন তা স্পষ্ট। কাকু কেন বিয়ে করেনি। ওর জগৎটা ছিল মাকে ঘিরেই। অস্মিতার মনে হল মা কাকুর সঙ্গে অন্যায় করেছে। মা কাকুকে বিয়ে করতেই পারত। তা হলে ও এক আইনি বাবা পেত। তারপর মনে হল এতে কোনও পার্থক্য হত না। অন্তরের সংযোগ সামাজিক সম্পর্কের থেকে অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি দৃঢ়। কাকু সব সময়ই ছিল। ওই কেবল দেখতে পায়নি।

“আমায় আর দোষী করো না” অস্মিতার চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জল গড়িয়ে পড়ছে।

ওদিকেও চোখে জল, দীপঙ্করও চশমাটা মুছল। কাঁপছে ঠোঁট, কাঁপছে হৃদয়। সন্তোষের পূর্ণ পরিণতি অনুভবে। সারা জীবন যখন দুঃখই তাকে ছায়ার মতো তাড়া করে বেড়িয়েছে।

অস্মিতা চোখ মুছল। ভেতর ভেতর এক অলক্ষিত যন্ত্রণায় চূর্ণ। আবেগের ঘূর্ণিঝড়ে অন্তর বিভ্রান্ত। জটায়ুর মতো বিশাল ডানা দিয়ে তাকে আগলে রেখেছে কাকু। কাকুর আবেগের অনুরণন তারই মধ্যে।

দুঃখের দুই নৌকো, দামাল ঝড়ের দাপটে অন্তহীন সময়ের সাগরে অসহায়তার পাল তুলে বাঁচতে চাইল, হারানো শ্রাবণধারায় ভিজতে ভিজতে। হারানোর মধ্যে পূর্ণতার ম্যাজিক ইউটোপিয়ায়।

***

সৌরিক অগ্নিদেবকে ফোন করল ‘‘কথা বলা দরকার’’

অগ্নিদেব কাজ থেকে ফিরে স্নান করে সবে একটা ড্রিংক বানিয়ে আরাম করছে। যেমন বাতাসে আর্দ্রতা তেমন গরম। এসিও পাল্লা দিতে পারছে না। এসির সার্ভিস দরকার। কিন্তু লকডাউনে কেউ আসবে কি না সন্দেহ।

‘‘তোমাকে এক্ষুনি ফোন করতাম। তদন্ত কেমন চলছে?’’ মল্টে চুমুক দিল অগ্নিদেব।

‘‘এতজনের থেকে এখন দুজনে। এক হল প্রমোটার রাস্তগি, যে মায়ের হরীশ মুখার্জি রোডের পৈতৃক বাড়িটা প্রমোট করছিল। আরেকজন অধীর বিশ্বাস, টলিউডের দাদা’’

‘‘খুব ভালো দু’জনে নেমেছে। ঠিক জান এই দুজনের একজনই খুনি?’’

‘‘নিশ্চিত হওয়া শক্ত। দুজনেরই খুন করার স্ট্রং উদ্দেশ্য’’

‘‘একজন, ও হ্যাঁ, প্রাঞ্জল বাগচি। বলেছিল রাস্তগিই দোষী। ওর সঙ্গে কথা বলেছ?’’

‘‘হ্যাঁ, প্রাথমিক কথা হয়েছে। আরও বলতে হবে। এর মধ্যে টুকরো টুকরো ঘটনা একত্র করছিলাম। রাস্তগি ঐশিকার সঙ্গে একটা চুক্তি করে। ওই হরীশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা ডেভেলপ করা ৬০-৪০ ভাগে। ও যদি ঐশিকাকে সরিয়ে দিতে পারে, পুরোটাই ওর লাভ’’

‘‘কী করে? মেয়ে আছে তো’’

‘‘পলিতা তো। উত্তরাধিকারের কাগজ চেয়েছে। এখন যেহেতু কোর্ট অফিস সব বন্ধ, ওই কাগজ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ভগবান জানে কবে এই লকডাউন শেষ হবে। যত দিনে আইনি কাগজপত্র জোগাড় করতে পারব, তত দিনে ও পুরো লাভ নিয়ে বেরিয়ে যাবে’’

‘‘এখনও যদি না করে থাকে তা হলে অবশ্যই করবে। খুব বুদ্ধি করে লকডাউনে খুনটা করেছে’’

‘‘সময় বলবে’’ সৌরিক আশাবাদী ‘‘অন্য জনের সঙ্গে কথা বলায় ঝকমারি অনেক। এই অধীরের আবার পলিটিক্যাল লিংকও আছে। আপাতদৃষ্টিতে ঐশিকা আরেকটা পাল্টা ইউনিয়ন তৈরি করেছিল, যারা অধীরের তোলাবাজির বিরোধিতা করছিল। এই গ্রুপটা ওর ‘সিন্ডিকেট রাজ’-কে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল। মেলে হুমকি দিয়েছে। তাই মাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলাটা অস্বাভাবিক নয়’’

‘‘দুজনেরই গুন্ডার দল আছে’’ অগ্নিদেব আরেকবার চুমুক দিল মল্টে।

‘‘একদম। যে কেউ করতে পারে। দুজনেই বেআইনি কাজে লিপ্ত। রাস্তগির জন্য আমাকে কাগজপত্র জোগাড় করতে হবে...’’

‘‘অস্মিতার ভাগ দেখাতে পারলেই কিন্তু প্রমাণ হয় না যে ও খুনি’’

‘‘প্রাঞ্জলকে ব্যবহার করা যেতে পারে তার জন্য। রাস্তগি ওকে ব্যবহার করছিল মাকে কনভিন্স করতে যাতে মা ওই বাড়িটা বিক্রি করে, আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। প্রাঞ্জল হয়ত সরাসরি যুক্ত নয়, কিন্তু কৌশল করে ব্যবহার করা যেতেই পারে’’

“শুভ কামনা! আমি এ খেলায় বহু দিন। এসব পাঁকাল মাছগুলোকে সামলানো সবচেয়ে মুশকিল। বুঝতেই পারবে না কখন পিছলে বেরিয়ে গেছে। একদম ভরসা করা যায় না। এরা বিপজ্জনকও। যে কোনও সময় রং পাল্টায়”

“চেষ্টা করে দেখা যাক। আমার চিন্তা, এই অধীর বিশ্বাসকে নিয়ে। ওর কাছে যেতেও পারছি না। আর ও কথাও বলবে না। ভাবছিলাম আপনি একবার...”

ওপর প্রান্তে নীরবতা। অগ্নিদেব চিন্তা করছে। এই অধীর বিশ্বাসের কথা জানার পর কোনও রকম কথা দেওয়া বোকামি। ওকে ভালো-মন্দ বিচার করে এগোতে হবে। রিটায়রমেন্টের আগে পেনশন আগুনে ঢালাটা ঠিক নয়।

“একটু চিন্তা করতে দাও কীভাবে ওকে জব্দ করে কথা বার করা যায়। তোমাকে জানাব” বলেই আচমকা লাইনটা কেটে দিল।

সৌরিক স্তম্ভিত এভাবে লাইনটা কাটতে দেখে। বুঝতে পারছে অগ্নিদেবের আপত্তি। অধীরের পলিটিকাল লিংকের ভয়? নাকি কোনও ভাবে কিছু চেপে যাওয়ার চেষ্টা? প্রথম থেকেই একটা গা ছাড়া ভাব। একটা ঠুনকো অজুহাতে কেসটা সৌরিককে দিয়ে দিল, লকডাউনে নাকি প্রচণ্ড কাজের চাপ। ঠিক ব্যাপারটা কী? আবার এমনও হতে পারে অধীরকে মোকাবিলা করার ছক কষতে ব্রেক নিল।

অগ্নিদেব চিন্তায়। এই অধীর বিশ্বাসের খোঁজ নিতে হবে। দেখেছে যেসব কলিগরা এই সব পলিটিশিয়ানদের সঙ্গে লাগতে গেছে তাদের কী দশা। পেনশন যে কোনও অজুহাতে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে, যদি অধীর দোষী না হয়। কী হবে? বড়জোর আর দশটা কেসের মতো কোনও সুরাহা হবে না। খুনের তদন্তের থেকে পেনশন অনেক বেশি জরুরি।

সৌরিকের অনিচ্ছার কারণটাও আঁচ করা যায়। এ ক্ষেত্রে অফিসিয়াল সুপারিশ ছাড়া এক পা-ও এগোতে পারবে না। এই বিতর্কময় পরিস্থিতি এড়িয়ে সাবধান হয়েই এগোতে হবে। একটা সহজ রাস্তা বার করতে হবে।

সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশনের ডিসিকে ফোন করল। “অগ্নিদেব চ্যাটার্জি, এসপি নর্থ ২৪ পরগনা। বিরক্ত করলাম। সব ঠিক আছে আপনার ওদিকে?”

“এখন নিয়ন্ত্রণে। আপনার কী অবস্থা?”

“ঈশ্বরের আশীর্বাদে ঠিকই চলছে। আপনাকে বিরক্ত করলাম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত এক অধীর বিশ্বাসের কথা জানার জন্য”

“হঠাৎ? ও তো টলিউড সিন্ডিকেটের কিংপিন! অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। অনেক পলিটিক্যাল লিংক”

“মিনিস্ট্রির সঙ্গেও?”

“অবশ্যই। কেন খুঁজছেন ওকে?”

“আমার এলাকায় এক অভিনেত্রীর খুনের তদন্তে”

“এই সময় লকডাউনের মধ্যে খুন! হায় ভগবান! এমনিতেই কী যথেষ্ট সমস্যা নেই?”

“সমস্যা কোনও দিন ছাড়ে না। কয়েকটা রুটিন প্রশ্ন করতে হবে, একটু আলাপ করিয়ে দেবেন? ওনাকে বিব্রত করতে চাই না”

“নিশ্চয়ই। আমার খুব ভালো বন্ধু। ওকে ফোন করে দেব”

“ওনার নাম্বারটা টেক্সট করবেন”

“করে দেব। কোনও খবর আছে এই লকডাউন আর কদ্দিন চলবে?”

“না কিছু খবর নেই। লকডাউন থাকাতে সুবিধাই হয়েছে। না হলে এই অবাধ্য ভিড় সামলাতে হত। আরও কাজ বেড়ে যেত”

“আর কী করা। ওর ভি-কার্ড পাঠিয়ে দিলাম। ওকে একটা ফোনও করে দেব”

যাক, নিশ্চিন্ত। এটা বেশ সাবধানে এগনোর রাস্তা। নিজেকেই বাহবা দিল। সরকারি চাকরিতে এই সাবধানতাটুকু বাঞ্ছনীয়। যেহেতু একজন প্রোমোটেড আইপিএস, সেহেতু খুব সাবধানে চলেছে যাতে কেউ ক্ষুণ্ন না হয়। এক বছর মাত্র বাকি। তারপরই মুক্তি। ভাগ্য সহায় হলে আরেকটা কাজ পেয়ে যেতে পারে বছর তিনের জন্য। নিজের সুবিধা দেখাটা তদন্তের থেকে অনেক বেশি দরকারি।

***

প্রাঞ্জল অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির। কিন্তু ওই একমাত্র যে রাস্তগির সব খবর দিতে পারে। সৌরিক জানে কীভাবে এসব লোককে বাগে আনতে হয়। সুযোগ পেলেই এরা অলীক গল্প ফাঁদে। এদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে হয়। কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।

ওকে ‘ম্যাট অ্যান্ড জেফ’ নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। ম্যাট আর জেফ অ্যামেরিকান কমিক্সের দুই চরিত্র যারা তথাকথিত অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ম্যাট নম্র, অভিযুক্তর প্রতি সমবেদনাশীল। অন্যদিকে জেফ অত্যন্ত রুক্ষ নিষ্ঠুর। তথাকথিত অপরাধীকে মারাত্মক শাস্তির হুমকি দেয়। একদম ম্যাটের বিপরীত। দুজনে একসঙ্গে বসে জেরা করলে, পালাক্রমে অভিযুক্তকে প্রশ্ন করে। অনেকটা ঠান্ডা-গরম ট্রিটমেন্ট। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর দেখা যায় অভিযুক্ত ম্যাটের কাছে সব স্বীকার করে, এই ভেবে যে, ম্যাট ওর পক্ষে। তবে এই পদ্ধতি দাগি অপরাধীদের ক্ষেত্রে কাজ করে না।

যেহেতু প্রাঞ্জল তেমন অপরাধী নয়, তাই ওর ওপর প্রয়োগ করাটা সমীচীন হবে। প্রাঞ্জলকে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল করল “আর কটা প্রশ্ন ছিল। এসপি অগ্নিদেব চ্যাটার্জি বললেন, আপনি ওনাকে বলেছেন যে, রাস্তগি দোষী হতে পারে। কোনও প্রমাণ আছে?” অপর দিক নিশ্চুপ। আবার বলল “এটা কিন্তু গুরুতর অভিযোগ। প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করা যায় না। এটা কি আপনি

আপনার কমিশন হারিয়েছেন বলে?'' মোবাইলে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ''ঝেড়ে কাশুন। না হলে ওনাকে সব সত্যি বলে দেব। যথেষ্ট কারণ আছে আপনাকে গারদে পাঠানোর। বুঝেছেন?''

''সরি স্যার। কী করে জানলেন আমার শেয়ারের কথা?''

''সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। আপনি আপনার কমিশন হারিয়েছেন তার জন্য রাস্তগিকে দোষী করছেন কেন? অন্য কেউও তো খুনটা করে থাকতে পারে। এটা খুব সিরিয়াস অভিযোগ''

প্রাঞ্জল বুঝতে পারছে ও জাঁতাকলে। রাস্তগি আদৌ ধরা পড়বে কি না সেটা পরের কথা। নিজে শ্রীঘরে পৌঁছে যেতে পারে। রাস্তগি যদি এ কথা জানতে পারে তা হলে শুধু যে চাকরিটাই যাবে তা নয়, নিজেও বেশ কয়েকটা হাঁড়পাঁজর ভেঙে হাসপাতালে পৌঁছে যাবে! নিজের থেকে পাঁচ লাখ টাকা রায়তিকে দিতে হয়েছে ওটা কোনও দিন ফেরত পাবে না। সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। রায়তি ওর কাজ করেছে তাই ওই ভাগটা ওর প্রাপ্য। রায়তির কাছে ফেরত চাইলে সস্তায় যাও বা পাচ্ছিল, তা-ও যাবে। দুদিকেই ল্যাং! এখন বসে আঙুল চোষ! রায়তির সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে যত দিন না টাকা উদ্ধারের একটা উপায় বার করতে পারে।

''স্যার, সত্যি বলছি। কোনও ধারণা নেই কে ঐশিকা ম্যামকে খুন করেছে। ওনার মৃত্যুতে আমার ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে গেছে। রাস্তগি আমার সঙ্গে চাকরের থেকেও খারাপ ব্যবহার করে''

''আপনি কী ভেবেছিলেন মিথ্যা অভিযোগ করে আপনি রাস্তগিকে জেলে পাঠাবেন? অতই সহজ?''

''ও রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেলে কিছু লুকানো টাকা আমার হাতে আসতে পারে। একমাত্র আমিই জানি ও টাকা কোথায়। ওর অনুপস্থিতিতে ওই টাকা পেতে পারি''

''আপনি যখন ওনাকে জড়িয়েছেন, এখন অপনার কাজ খুনের দিন ও কোথায় ছিল সেটা খুঁজে বার করা''

''উনি প্রীতির সঙ্গে ছিলেন''

''প্রীতি কে?''

''ওনার রক্ষিতা''

''কী করে জানলেন?''

''সেদিন বেলার দিকে উনি আমায় ফোন করে বলেন, ওয়ালেটটা প্রীতির বাড়িতে ফেলে এসেছি। নিয়ে এস''

প্রীতি কাছেই থাকে। যখন নিতে গেলাম তখন প্রীতি বলল 'ও আজকাল ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। সারা দিন এখানে ছিল। হঠাৎ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল। ওয়ালেটটাও ফেলে গেছে। কার্ড ছাড়াও তিরিশ হাজার টাকা নগদ আছে। ওকে ফোন করে বলে দিচ্ছি, আমি আপনাকে টাকা সমেত ওয়ালেট ফেরত দিয়েছি'''

‘‘উনি নিজে কেন ফেরত নিতে যাননি?’’

‘‘ওনার স্ত্রী দেবিকা হয়ত আবার বেরতে নিষেধ করেছিলেন এই মহামারীর সময়, যদিও নিশ্চিত নই। যা হোক, আমি ওয়ালেট ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিই। তাই উনি ক্রাইম সিনে ছিলেন না’’

‘‘প্রীতির বাড়ি থেকে বেরিয়ে একবার ঘুরে যেতে পারতেন না?’’

‘‘যতটা সময় হাতে পেয়েছিল তাতে সম্ভব নয়। যখন ওয়ালেটটা ফেরত দিই তখন উনি তো খুব শান্ত ছিলেন। এরকম একটা খুন করার পর সাধারণ মানুষ তো এত শান্ত থাকতে পারে না’’

ঠিক। যদি না সে পাকা খুনি হয়। রাস্তগি তা নয়। প্রাঞ্জলের এ কথা বিশ্বাসযোগ্য? সেটাও আরেক সমস্যা। এই মিথ্যেবাদীটা যা ইচ্ছে গল্প তৈরি করতে পারে। এই লকডাউনের মধ্যে আর কোনও উপায় নেই ওর গল্পের সত্যতা বিচারের। তাই বেনিফিট অফ ডাউট দিতেই হবে।

‘‘আপনি আগে যে ইতিহাস রচনা করেছেন তারপর কী করে বুঝব এবার সত্যি কথা বলছেন?’’

‘‘প্রীতি বাদে, রাস্তগির একমাত্র আলিবাই আমি। আমি না বললে প্রীতির কথা আপনি জানতেও পারতেন না। সত্যিটা না বললে রাস্তগি সন্দেহের তালিকায় প্রথম থাকত’’

সৌরিক যেমন মনে করেছিল তা নয়। এই লোকটা ফাঁক-ফোকরগুলো জানে। সৌরিক হাসল ‘‘সত্যিটা বলার জন্য ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চিত তো আর কোনও কিছু নেই?’’

‘‘একদম। আমার পাওনা তো জলাঞ্জলি গেল! একটা অনুরোধ করব স্যার?’’

‘‘হ্যাঁ, বলুন’’

‘‘অস্মিতা ম্যাম যখন ওই প্রপার্টিটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন. তখন যদি আমার ১০% কমিশনটা দিয়ে দেন’’

‘‘১০% এর কথা দিতে পারছি না। তবে রায়তিকে যা দিয়েছেন সেটা পাবেন। সঙ্গে অপনার জন্য আরও কিছু। সে এখন অনেক দূরের ব্যাপার। কোর্ট খুলবে তারপর তো। তবে একটা শর্ত আছে। রাস্তগির সঙ্গে এই ব্যাপারটা মেটাতে আমাকে সাহায্য করতে হবে। না হলে ওকে আপনি দোষী সাব্যস্ত করার যে বিফল চেষ্টা করেছেন তা বলে দেব’’

‘‘আপনাকে কথা দিচ্ছি’’

সৌরিক লাইন কেটে দিল। তা হলে রাস্তগি দোষী নয়। তার মানে এখন ওর সন্দেহের তালিকায় একমাত্র থাকছে অধীর বিশ্বাস। অগ্নিদেব যতক্ষণ না ওর ডিটেলস দিচ্ছে, সৌরিক আটকে। অস্মিতা আর দীপঙ্কর সেনের আলোচনার কথা ও জানে। কোর্ট বন্ধ থাকাকালীন একবার দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে কথা বলতে হবে যদি উনি অস্মিতার দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে কিছু জানেন। অন্তত কোন এজেন্সি থেকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল সেটাও যদি জানা যায় তা হলেও সৌরিক অ্যাডপশন সার্টিফিকেট

জোগাড় করতে পারে। রাস্তগির মুখের ওপর ছুড়ে দেবে। এখন শুধু প্রার্থনা সেই সার্টিফিকেট যাতে পাওয়া যায়।

***

ডিসি সাউথ আশ্বস্ত করাতে অগ্নিদেব অধীর বিশ্বাসকে ফোন করল ‘‘অগ্নিদেব চ্যাটার্জি এসপি উঃ ২৪ পরগনা। ডিসি সাউথ ওয়েস্ট আপনাকে নিশ্চয়ই বলেছেন আমি ফোন করব। এখন কথা বলা যেতে পারে?’’

‘‘হ্যাঁ, পরিমল হালদার বলেছিল বটে। কথা বলা যেতেই পারে। বাড়ি ফিরে এসেছি’’

‘‘ঐশিকা রায়ের মৃত্যুর দিন আপনি কোথায় ছিলেন?’’

‘‘কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হয়ে আমরিতে ভর্তি ছিলাম’’

‘‘ক’দিনের জন্য?’’

‘‘দু সপ্তাহের জন্য’’

অগ্নিদেব সময়টা হিসেব করে নিল। ও যদি খুনের দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকে, ও তা হলে খুন করতে পারে না। যদিও আমরির সঙ্গে যাচাই করতে হবে। নিশ্চয়ই মিথ্যে বলবে না।

‘‘দুঃখিত’’

‘‘বেঁচে আছি এই রক্ষে। ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা হয়েছে তাই। না হলে আমিও এই মারাত্মক ভাইরাসের শিকার হতাম’’

‘‘হ্যাঁ, আপনি ভাগ্যবান। এই ভাইরাস যে কত জনের প্রাণ নিচ্ছে!’’

‘‘গুরুর কৃপা। আপনি কী কথা বলতে চেয়েছিলেন?’’

‘‘রুটিন এনকোয়ারি। টলিউডের নামকরা অভিনেত্রী ঐশিকা রায়ের খুনটা আমার এলাকায় হয়েছে’’

‘‘ওটা খুন ছিল? শুনেছি বটে, কিন্তু কেউ কারণটা বলতে পারেনি’’

‘‘গুলি করে। বুকে গুলি লেগে। ওর কী অনেক শত্রু ছিল?’’

‘‘আমাদের সবারই আছে। তবে হাতে গোনা কয়েকজনই খুন অবধি যেতে পারে, যদি তেমন স্বার্থ থাকে’’

‘‘তেমন কারও কথা মনে পড়ে?’’

‘‘যদিও উনি বহুদিন ইন্ডাস্ট্রিতে, লোকজনের সঙ্গে খুব কমই মিশতেন। বলতে গেলে ষোল আনা পেশাদার। বাকি সময়টা নিজের জগতেই। ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের কাজ। অল্প বয়েস থেকেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। ওঁর বক্স অফিস সাফল্যের জন্য প্রযোজকরা পছন্দ করত’’

‘‘তাও... আপনি যেহেতু ইন্ডাস্ট্রির খুব কাছের লোক, আপনি কিছু আলোকপাত করতে পারবেন?’’

‘‘না, কিছুই জানি না ওঁর ব্যাপারে’’

“আপনার সঙ্গে?”

“আর পাঁচজনের মতোই” কৌশল করে এড়িয়ে গেল নিজেদের দ্বন্দ্ব। ঐশিকার অবর্তমানে তো কেউ কথাটা বলবে না।

“বুঝতেই পারছি না কে ওকে খুন করতে চাইবে, বিশেষ করে এই প্যানডেমিকের মধ্যে। উদ্দেশ্য ছাড়া এ তো অসম্ভব। স্টুডিও বন্ধ। তাই স্টাফদেরও জিজ্ঞেস করার উপায় নেই”

“শুনেছিলাম ওনার এক মেয়ে আছে। সে কিছু বলতে পারল না?”

“নাঃ! সে আবার দিল্লিতে আটকে রয়েছে। মাকে শেষবারের মতো দেখতেও পায়নি”

“সত্যি দুঃখের। ওকে আমার সমবেদনা জানাবেন। এখন স্টুডিওগুলো খুলবে। আরও মিথ ছড়াবে। আমার কানে কিছু এলে আপনাকে ফোন করব। এটাই আপনার নম্বর তো? অগ্নিদেব চ্যাটার্জি নামে সেভ করছি”

“সাবধানে থাকবেন। ঈশ্বর যদি আপনাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিয়ে থাকেন, তা হলে নিশ্চয়ই তার একটা কারণ আছে। সদ্ব্যবহার করুন”

“শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ। আপনিও ভালো থাকবেন”

ডিসকানেক্ট করার পর আমরি থেকে যাচাই করে নিল। হ্যাঁ, ওই সময় অধীর বিশ্বাস আমরিতে ভর্তি ছিল। দুদিন আগেই ছাড়া পেয়েছে। হাসপাতালে থাকাকালীন নিজের শরীরের চিন্তাই বেশি। খুনের প্ল্যানিং করা সম্ভব নয়। ও ঐশিকার খুনি নয়।

সৌরিককে খবরটা দিয়ে দিল “অধীর বিশ্বাস কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে ঢাকুরিয়ার আমরিতে ভর্তি ছিল। ও খুনি হতে পারে না, যদি না কোনও গুন্ডা পাঠিয়ে খুন করিয়ে থাকে”

“নিশ্চিত?”

“আমরির সঙ্গে কথা বলে যাচাই করে নিয়েছি। তবে কাউকে পাঠিয়েছিল কি না সেটা জানা অসম্ভব”

সৌরিক আরেকবার ধাক্কা খেল। সন্দেহের তালিকার দুজনই নির্দোষ। যথেষ্ট প্রমাণ আছে দুজনেরই। এত খাটনি সব বেকার। নেট রেজাল্ট শূন্য! যেখান থেকে শুরু করেছিল আবার সেখানেই। এগোনোর আর কোন সূত্র নেই। একটা কথা স্পষ্ট, শার্লক হোমস যাই বলে থাকুন না কেন, খুনের তদন্ত করা ‘এলিমেন্টারি’, কখনও নয়। ও না পুলিশের লোক, না কোনও কেউকেটা যে এগিয়ে যাবে। তার ওপরে কোয়ারানটিন!

ভাবছিল কেসটা অগ্নিদেবকে ফেরত দেবে। তবে আরও দুদিন শেষ চেষ্টা করে দেখাই যাক না। আরেকবার সব কল, মেসেজ, মেল চেক করে দেখতে হবে কিছু চোখ এড়িয়ে গেছে কি না। কোনও

লিংক আগে হয়ত মনে হয়েছিল অদরকারি, সেগুলো আরেকবার পরখ করে দেখা দরকার। কোনও সূত্র হয়ত লুকিয়ে থাকতে পারে... আবার দেখবে। অস্মিতার সঙ্গেও কথা বলতে হবে।

"আরেকবার চিন্তা করে দেখি" সৌরিক বলল।

"যেমন ইচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেসটা অমীমাংসিত হিসেবে তুলে রাখতে হবে" অগ্নিদেব ফোন রেখে দিল।

সৌরিক এক বিশাল গোলকধাঁধায়। শুধু আশা করছে যেন অধরা সত্য বাইরের নির্লিপ্ত চাঁদের মতো উন্মোচিত হয়।

***

শেষ পর্যায় পৌঁছে, এখন আবার সব নতুন করে দেখা। নতুন ভাবে চিন্তা করা। এর জন্য সময় লাগবে। আদৌ খোলাসা করতে পারবে কি না সেটা এখনও রহস্য। নতুন কিছু সূত্রের জন্য মেলগুলো আবার সৌরিক দেখছিল। হঠাৎ মনে পড়ল অস্মিতার উত্তরাধিকারের কাগজগুলোর ব্যবস্থা করা দরকার। কোর্ট কবে খুলবে জানা নেই। তাই এখন একটাই কাজ। দত্তকের সার্টিফিকেট জোগাড়। মায়ের মৃত্যুর পর জানেও না, কোথায় মা সেই কাগজ রেখেছে। অন্য উপায়, দত্তক দেওয়ার এজেন্সি থেকে নেওয়া। শুধু যদি এজেন্সির নামটা জানত!

অস্মিতার থেকে যা জেনেছে, দীপঙ্কর সেনের সঙ্গে মায়ের খুব বন্ধুত্ব ছিল অল্প বয়েস থেকেই। একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

"সৌরিক বলছি, অস্মিতার স্বামী"

"হ্যাঁ বল, কেমন আছ?"

"বড্ড বিপদে পড়েছি। অস্মিতা যে মায়ের একমাত্র আইনি উত্তরাধিকারী সেটা প্রমাণ করতে হবে। কোর্ট বন্ধ থাকায় সে তো একরকম অসম্ভব। আপনি যেহেতু অনেক দিনের পরিচিত, ভাবছিলাম আপনি কিছু যদি বলতে পারেন"

"তুমি হয়ত অস্মির কাছে প্রথম দিকের কথা শুনেছ। টলিউডে একবার নিজের জায়গা প্রশস্ত করার পর ফুচু একটা বাচ্চার জন্য পাগল হয়ে গেছিল। ওর তো হিস্ট্রেক্টমি করতে হয়েছিল"

"ফুচু?"

"ওহ! ওটা ঐশিকার ডাক নাম। বাচ্চা কোন পরিবেশ থেকে আসছে সে নিয়ে ও খুব পিটপিটে ছিল। চেয়েছিল বাচ্চা যেন শিক্ষিত পরিবারের হয়। শেষ পর্যন্ত একটি বাচ্চার খোঁজ পায় সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার থেকে। এখানেই, বেকবাগানে, কর্নেল বাগচি রোডে। বেবিটি এক শিক্ষিত অবিবাহিতা মায়ের। ভালো পরিবার। সেখান থেকে অস্মিতাকে দত্তক নেয়"

কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেদিন ফুচু বাচ্চা নিয়ে বাড়ি এল। কয়েকদিন ধরেই একটা নাম খুঁজছিল। শেষে এই নামটাই ঠিক করল। বাচ্চাটি খুবই আদুরে, হৃষ্টপুষ্ট, ওর মায়ের মতো। দুনিয়ার সঙ্গে একজোট হয়ে লড়তে হবে তো! সমাজ আছে অবিবাহিত মায়েদের ব্যাপারে নিজস্ব ধারণায়।

ঐশিকাকে বিয়ে করেও দীপঙ্কর ওই বাচ্চাটিকে মেনে নিতে পারত। কিন্তু ভীষণ জেদি ঐশিকা। তাই শেষ পর্যন্ত দীপঙ্করকেই হার মানতে হল। ও চিরকাল ওকে ভালোবেসেছে। শেষ দিন পর্যন্ত। তাই নিজেও বিয়ে করেনি। সৌরিকের চোখে না পড়লেও, দীপঙ্করের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। লোকেরা হামেশাই লক্ষ করে না একান্তে এই নীরব অশ্রুপাত। মর্মভেদী আত্মার প্রকৃত আয়না। কেউ আন্দাজও করতে পারে না তার অসামান্যতা। নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

''ওর মায়ের নাম?''

''জানি না। শুনেছিলাম বাচ্চাটিকে এজেন্সির হাতে তুলে দিয়ে নাকি স্টেটসে চলে গেছে''

''আপনার কী মনে হয় ওই এজেন্সি এতদিনের সব রেকর্ড রাখবে?''

''হলপ করে বলতে পারছি না। তবে রাখা তো উচিত''

''এখন এই লকডাউনের মধ্যে কী খোলা থাকবে?''

''খোঁজ নিয়ে দেখ। অস্মি বলছিল তুমি নাকি ফুচুর খুনের তদন্ত করছ। কিছু হদিস পেলে?''

''এতদিন করছিলাম। এখন একদম দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এগোতেই পারছি না। কিছু একটা মিস করছি। ধরতে পারছি না। কতবার শুনেছি অপরাধ সব সময় চিহ্ন রেখে যায়। নিশ্চয়ই কিছু বাদ পড়ছে''

''আশা করি তুমি এর কিনারা করতে পার। ও তো কারও পাকা ধানে মই দেয়নি, যে ওকে খুন করতে পারে?''

''আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?''

''এক প্রমোটারের সঙ্গে ওর পৈতৃক বাড়ি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, তাছাড়া তো আর কারও সঙ্গে কোনও গন্ডগোল ছিল না''

''রাস্তগি। না, ওর ব্যাপারটা আমি দেখে নিয়েছি। ও দোষী নয়। খুনটা যখন হয় তখন ও অন্য কোথাও ছিল''

''অস্মি বলল যে ও ফুচুর মৃত্যুর খবর হোয়াটসঅ্যাপে পেয়েছিল কোনও এক অপরিচিত নম্বর থেকে। ওই নম্বরটা ট্রেস করেছ?''

এসপি অগ্নিদেব চ্যাটার্জিকে বলেছিলাম। উনি চেক করে বলেছেন ওটা একটা প্রিপেড নম্বর, আইডেন্টিটি অজানা। এই জালি সিম কার্ড সর্বত্র পাওয়া যায়। ওই আইএমইআই নম্বরটাও ট্রেস করা

যায়নি। ফোনটা হয়ত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে”

“তুমি ওর দত্তক নেওয়ার ডিটেলস জানতে পারলে আমাকে জানিও”

“নিশ্চয়ই জানাব। অনেক ধন্যবাদ”

ফোনটা নামিয়ে রেখে সৌরিক চিন্তা করল... নতুন খবর! অস্মিতা অবৈধ সন্তান! মা ওকে দত্তক নিয়ে সমাজে একটা সুন্দর পরিচয় দিয়েছে। ওর জন্য এ এক বিরাট আশীর্বাদ। এখন ওই দত্তকের সার্টিফিকেট ছাড়াও, ওর আসল মা-বাবার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করছে। তাতে অবশ্য ওদের জীবনে কোনও হেরফের হবে না। তবুও জানতে ইচ্ছা। অস্মিতা খুবই চৌকস, মেধাবী এবং শিক্ষিত। এসব নিশ্চয়ই ওর বাবা-মার থেকে পাওয়া। মা যে বাচ্চা দত্তক নেওয়ার আগে এতটা যাচাই করেছিল, এ জন্য তাঁর প্রশংসা না করে পারল না।

ও নেটে ‘সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার’-এর খোঁজ করতেই সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে!

***

কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে পরিষ্কার লেখা ‘সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার’ এর ওয়েবসাইটে। সৌরিক ওদের কর্নেল বিশ্বাস রোডে ফোন করবে ঠিক করল।

“আপনাদের এজেন্সি থেকে একটা দত্তক নেওয়া হয়েছিল, তার খবর বলতে পারবেন” সৌরিক জিজ্ঞেস করল নিজের পরিচয় দেওয়ার পর।

অপর প্রান্ত থেকে এক মহিলা বললেন “লকডাউনের জন্য এখন সব বন্ধ। যখন অফিস খুলবে তখন ফোন করবেন”

“আসলে আমার একটু তাড়া আছে” অনুনয় সৌরিকের।

“তা হলে মেল করবেন। ফোনে কিছু বলা যাবে না। সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করে ওনার পারমিশন নিতে হবে। যখন মেল করবেন, অপনার যোগাযোগের ঠিকানা দেবেন, যাতে আমরা রিভার্ট ব্যাক করতে পারি” ফোন রেখে দিল ভদ্রমহিলা।

সৌরিক ওদের মেল করল নিজের পরিচয়, অস্মিতা সঙ্গে ওর সম্পর্কের ডিটেলস জানিয়ে। আরও লিখল অস্মিতাকে যে ঐশিকা রায় দত্তক নিয়েছিল, সম্প্রতি খুন হয়েছে। উত্তরাধিকারের জন্যই দত্তকের সার্টিফিকেট দরকার। সঙ্গে এটাও লিখল, ওরা যদি অস্মিতার আসল মা-বাবার পরিচয় দিতে পারে।

উত্তর চলে এল দুদিনের মাথায়! জানতে চায় কোন বছর দত্তক নেওয়া হয়েছিল, যাতে কম্পিউটার রেকর্ড দেখতে পারে।

সৌরিক ফোন করল দীপঙ্কর আঙ্কলকে “বলতে পারেন কোন বছর অস্মিতাকে দত্তক নেওয়া হয়েছিল?”

“সঠিক বলতে পারব না। তবে ৭২, ৭৩ অথবা ৭৪”

“ধন্যবাদ”

সৌরিক ওদের সে কথা মেলে জানিয়ে দিল। পরের দিনই উত্তর। ওদের তথ্য অনুযায়ী ঐশিকা রায় অস্মিতাকে দত্তক নিয়েছিল ৭ জানুয়ারি ১৯৭৩। এ-ও জানাল, অস্মিতা কোনও এক অরুণিমা বিশ্বাস আর অগ্নিদেব চ্যাটার্জির মেয়ে। সঙ্গে তাদের দুজনের ঠিকানা। অরুণিমার ঠিকানা লেক গার্ডেন্স আর অগ্নিদেবের পটুয়াপাড়া, ২৩ পল্লী দুর্গামন্দিরের কাছে।

সৌরিক ‘সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার’ অফিসে ফোন করল, “অসংখ্য ধন্যবাদ এত তাড়াতাড়ি খবর জানানোর জন্য। তবে একটা প্রশ্ন ছিল। বাচ্চাটাকে কী অরুণিমা আর অগ্নিদেব দুজনেই সোসাইটিকে হস্তান্তর করেছিল?”

“এক মিনিট, দেখে বলছি। ফোনটা ধরে থাকুন”

পুরো দশ মিনিট ওকে ঝুলিয়ে রেখে শেষমেশ ভদ্রমহিলা বলল “আমাদের নোটে বলছে বেবিকে অরুণিমা একাই হস্তান্তর করেছিল। সঙ্গে বাবা হিসেবে অগ্নিদেবের নাম। বার্থ সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিচ্ছি”

দু’দিন পর সার্টিফিকেটের স্ক্যান্ড কপি মেলে চলে এল। ওখানে লেখা, অরুণিমা বিশ্বাস আর অগ্নিদেব চ্যাটার্জির বেবি। জন্ম হয়েছে কেডিকিওর এস সি দাস মেমোরিয়াল মেডিক্যাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, যোধপুর পার্কে।

এ কী এসপি অগ্নিদেব চ্যাটার্জি? ওর আবছা মনে পড়ছে কোথাও শুনেছিল যে, ওরা যতীন দাস পার্কে পটুয়া পাড়ায় থাকত। ২৩ পল্লী মন্দিরের কাছে। সে নিশ্চয়ই এই অগ্নিদেবই। বুঝেছে, অস্মিতাকে অবিবাহিতা অরুণিমা জন্ম দেয়। আন্দাজ করতে পারছে কেন অরুণিমা অস্মিতাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কে এই অরুণিমা বিশ্বাস? ওর কন্টাক্ট ডিটেলস পেলে ভালো হত। অগ্নিদেব কী অস্মিতার কথা জানে? জিজ্ঞেস করতে হবে।

সৌরিক নিজের আন্দাজ বা ধারণার ওপর বিশ্বাস করে। তার মানে, অগ্নিদেবের একটা গোপন অজানা অতীত আছে। নেটে ডিটেলস খুঁজলেও কিছুই পেল না। এখন একটাই উপায়, খোদ স্বীকারোক্তি। বুঝে উঠতে পারছিল না, আগে অস্মিতাকে জানাবে, নাকি আগে অগ্নিদেবের সঙ্গে কথা বলবে। নির্ধারণ করার আগে দীপঙ্কর আঙ্কলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ফোন করল।

“সোসাইটি অব ইন্ডিয়ান চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার সমস্ত ডিটেলস পাঠিয়ে দিয়েছে। অস্মিতাকে ৭ জানুয়ারি ১৯৭৩-এ দত্তক নেওয়া হয়। আসল বাবা-মায়ের নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলেছে, অস্মিতা অরুণিমা বিশ্বাস ও অগ্নিদেব চ্যাটার্জির মেয়ে। যা অ্যাড্রেস দিয়েছে তাতে তো অগ্নিদেব সেই এসপি যে এই কেসটা দেখছে। আপনি এই অরুণিমার সম্বন্ধে কি কিছু জানেন?”

“না। দাঁড়াও, নামটা শুনেছি কোথাও”

“কী ব্যাপারে?”

“হঠাৎ মনে পড়ছে না। কী যেন ছিল... এতদিন আগের কথা...” দীপঙ্কর স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে “কোথায়, কখন ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ডেফিনিটলি নামটা শোনা...”

“চিন্তা করুন প্লিজ। মনে পড়লেই জানাবেন”

‘অরুণিমা’এই দুর্বোধ্য নামটা দীপঙ্কর আঙ্কলের চৌহদ্দিতেও ছিল! অগ্নিদেবের প্রণয়িনীও হতে পারে। সৌরিক শুধু প্রার্থনা করছে আঙ্কল যেন ওই ভদ্রমহিলাকে মনে করতে পারেন।

এই বিষয়টা পাশে সরিয়ে রেখে, সৌরিক আবার মন দিল সম্ভাব্য অপরাধীদের ওপর। রহস্যটা এখনও সমাধান করা হয়নি। রাস্তগি আর অধীর, দুজনেরই অ্যালিবাই স্ট্রং। তা হলে খুন করল কে? আবার মেল, কল লগ আর অ্যাকাউন্টস দেখতে লাগল, যদি কোনও কিছু চোখে পড়ে।

পরের দিন আঙ্কলের ফোন “হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ওকে দেখেছি এনএবিসিতে, লাস ভেগাসের ওয়েস্ট গেট ক্যাসিনো অ্যান্ড রিসর্টে”

“এনএবিসিটা কী?”

“উত্তর আমেরিকার বার্ষিক সাংস্কৃতিক মিলন উৎসব। আয়োজন করে ইউএসএ-র কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। বিজনেসের ব্যাপারে আমি তখন ওখানে। আমার এক বন্ধু নিয়ে গেছিল। নামটা ছিল অরুণিমা বিশ্বাস সরকার। বেশ কয়েকটা গান পরিবেশন করে। খুব ভালো গায়িকা। একই হবে মনে হয়। ‘সরকার’-টা যোগ হয়েছে বিয়ের পর”

“স্টেটসে থাকে?”

“জানি না এখন কোথায়। ডিনারে বলছিল নিউ ইয়র্কে থাকে। যত দূর মনে পড়ে বেশ ভালো মহিলা”

“বয়েস কত হবে?”

“ফুচুর বয়সি, মানে ঐশিকার সমসাময়িক”

“অস্মিতাকে খবরটা দেওয়ার আগে ভালোই হল ওর আসল মায়ের নাম জানা গেল”

“আমি যদি জানতাম অস্মিতা ওর মেয়ে, ওর সঙ্গে আরেকটু আলাপ করে জানার চেষ্টা করতাম। তবে আদৌ নিজের অতীতের কথা বলত কি না সন্দেহ। তুমি কত দূর এগিয়েছ ঐশিকার খুনের?”

“এখনও চলছে। বেশি এগোতে পারছি না”

ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস! কুমারী মা অস্মিতাকে ত্যাগ করল। আরেক কুমারী মা তাকে দত্তক নিল। প্রকৃত বাবা জানেই না তার অস্তিত্ব। দীপঙ্কর সেন অনাত্মীয় হয়েও অস্মিতার জীবনে বাবা!

মানুষ শুধু সমাজের চিহ্নিত সম্পর্কের গণ্ডিতেই আবদ্ধ। এই মেয়েটিই সম্পর্কের বৈচিত্র্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

***

অগ্নিদেবকে এই নতুন খবরটা ফোনে দেওয়ার থেকে সৌরিক ঠিক করল ওর বাড়িতে গিয়েই দেবে।

"দেখা করা দরকার। কখন ফ্রি থাকছেন?"

"আর্জেন্ট?"

"না, ইমারজেন্সি নয়। তবে যত তাড়াতাড়ি হয় ভালো"

"তা হলে শুক্রবার সন্ধেবেলা এস, যদি না আবার কাজে আটকে পড়ি"

"ঠিক আছে। যাওয়ার আগে ফোন করে নেব"

সৌরিক যখন অগ্নিদেবের বিধাননগর পুলিশ কোয়ার্টারে পৌঁছল তখন সন্ধে সাড়ে সাতটা। বাড়ি থেকে বেরোতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ফাঁকা বাইপাস দিয়ে আসতে বাতাসের ঘ্রাণ একদম গ্রাম বাংলার বিশুদ্ধ হাওয়ার মতো। অস্মিতা যখন কলকাতায়, ওরা দুজন প্রায়ই বেরিয়ে পড়ত নাম না-জানা গ্রামের উদ্দেশে। যেখানে প্রাচুর্যের ডালি ভরে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

দুজনেরই প্রকৃতি প্রিয়। শহরের হট্টগোল থেকে অনেক দূরে, গহন সবুজ অরণ্যের মধ্যে, ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় বসে অপলক চেয়ে থাকত বিস্তৃত প্রকৃতির সবুজে। ধীর পায়ে সন্ধ্যা নামত ক্লান্ত অবসন্নতার শিথিল আঁচল বিছিয়ে। আকাশের এঘর, ওঘর, সেঘরের দরজা খুলে সব ঘরেই একটা একটা করে তারার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। জঙ্গলের অন্ধকারে ঢাকা সবুজের সঙ্গে পশু-পাখিদের এক অপরূপ ছন্দোময় সুরের ঐকতান। দূরে গ্রামের কুঁড়েঘরগুলোতে টিমটিমে সন্ধ্যাপ্রদীপ। রাতের ওড়না যখন আচ্ছাদন করে ফেলেছে, অস্মিতার গলায় পূরবীর সুর। মৃদুমন্দ বাতাসে তারই মূর্ছনা। উদীয়মান চাঁদের শান্ত আভায় স্নাত। প্রকৃতি যেন তার বিশুদ্ধ লহরায় সঙ্গত করছে অস্মিতার রাগের বাহারে।

"আসতে অসুবিধা হয়নি তো?" অগ্নিদেব ঘরে নিয়ে গেল।

একটু আগেই বাড়ি ফিরেছে। রোজকার মতো স্নান সেরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে সৌরিকের অপেক্ষায় ছিল।

"একদম না। রাস্তা ঘাট শুনসান। এই বাইপাস আগে কোনও দিন দেখিনি"

"ড্রিংক?"

সৌরিক মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। ওকে ড্রাইভ করে ফিরতে হবে। তাই মেপে খাওয়া জরুরি। অগ্নিদেব আবেরলৌর অ'বুনাধের বোতল বার করল ''রোজ তো একাই খাই, আজ তুমি আছ''

এক সিপ খেয়ে সৌরিক মুগ্ধ ''দারুণ। আগে কখনও খাইনি''

অগ্নিদেব কটা ভুজিয়ার প্যাকেট রাখল ''সারাদিন কাজের পর এটাই আমার শৌখিনতা। তদন্ত কেমন এগোচ্ছে?''

''আরে, তদন্ত রাখুন। আপনি কী কোনও অরুণিমা বিশ্বাসকে চিনতেন?''

চমকে উঠল অগ্নিদেব! ধুপ করে বসে পড়ল সোফায়। এক ঢোঁকে পুরো গ্লাস খালি ''কেন?''

''শুধু বলুন। সেজন্যই এসেছি। যে কি না লেক গার্ডেনসে বহু দিন আগে থাকত?''

''কেন? কী হয়েছে?'' গলা কাঁপছে।

''কিছু না। শুধু উত্তর দিন''

অগ্নিদেব আরেকটা ডবল ঢেলে অর্ধেকটা শেষ করে ফেলল ''হ্যাঁ, ও আমার বান্ধবী ছিল। কিন্তু সে তো বহু বছর আগের কথা। তুমি কী করে জানলে?''

''অস্মিতার দত্তকের সার্টিফিকেট খুঁজতে গিয়ে এই নামটা পেলাম। ওর আসল বাবা-মায়ের নাম। আপনি ও অরুণিমা ওর আসল বাবা-মা। অস্মিতা আপনাদেরই সন্তান। জানতেন কী, আপনার একটা মেয়ে আছে?''

অগ্নিদেব স্তব্ধ। অতীত উন্মুক্ত। বর্তমানের সামনে সে বসে। মনে পড়ছে শহরের ভিড়ের মাঝে ওদের স্বপ্নমাখা একান্ত নিবিড় মুহূর্তগুলো। দুজনে শেষবারের মতো দেখা করেছিল অরুণিমার লেক গার্ডেনসের বাড়িতে। লোধাশুলিতে গা ঢাকা দেওয়ার আগে। দুজনেই হারিয়েছিল মধুর মিলনযজ্ঞে, ভালোবাসার পূজায়। তারই অর্ঘ্য অস্মিতা। হয়ত সেদিনেই অস্মিতার ভ্রূণজন্ম।

''না, জানতাম না। কলেজের গোরায় নকশাল মুভমেন্টে জড়িয়ে পড়েছিলাম। অরুণিমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সবই ঠিক চলছিল। হঠাৎ অপারেশন স্টিপলচেস। নকশালদের হয় গ্রেফতার নয়তো খুন করা হল। এভাবেই শেষ হল এক উজ্জ্বল প্রজন্মের বিস্তার''

''জানতাম না তো, আপনি নকশাল মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন''

''দাদা আর আমি। দুজনেই খুব অ্যাকটিভলি জড়িয়ে পড়েছিলাম। গা ঢাকা দিতে কলকাতা থেকে বেরিয়ে যেতে হয় লোধাশুলিতে। যাওয়ার আগে একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম ওর লেক গার্ডেনসের বাড়িতে'' অগ্নিদেব ড্রিংকটা শেষ করে ফেলে কাঁপা হাতে আবার একটা ডবল ঢালল ''সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। তাই... সেদিনই হয়ত ও কনসিভ করেছিল। লোধাশুলিতে দাদা ঋদ্ধদেবকে পুলিস গুলি করে মারে। আমায় ধরে ফেলে। পরে কমিউনিস্ট সরকার পাওয়ারে এলে ছাড়া পাই''

“এরকম পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে এই চাকরি পেলেন কী করে?”

“ছাড়া পাওয়ার পর জানতে পারলাম, অরুণিমা বিয়ে করে স্টেটসে চলে গেছে। সেই মুহূর্তে আমার কাছে কিচ্ছু ছিল না। মতাদর্শ ধোঁয়াশায়, দাদা ঋদ্ধদেবকে পুলিস গুলি করে মেরে ফেলেছে। সে সময় প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনটাকে আবার নতুন করে গড়ব। আইপিএস-এর জন্য তৈরি হচ্ছিলাম যখন হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। দুর্দশার শেষ নেই। তখন ফ্রেশ রিক্রুটমেন্ট চলছিল। সংসার বাঁচাতে কনস্টেবলের চাকরি নিলাম। সব স্বপ্নের জলাঞ্জলি। সেই থেকে শুধু টিকে থাকা”

“যাক, অস্মিতার বার্থ সার্টিফিকেটটা পেয়েছি। ওর জন্ম যোধপুর পার্কের কেডিকিওর এস সি দাশ মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ও রিসার্চ সেন্টারে। আপনাদের দুজনের নামই সেখানে নথিভুক্ত”

গ্লাসে চুমুক দিয়ে অগ্নিদেব বলল “তখন নিশ্চয়ই আমি জেলে”

“হুঁ। পরে, অরুণিমা যে কোনও কুমারী মায়ের মতোই বাচ্চাটিকে অ্যাডপশন সেন্টারে দিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চলে যায় স্টেটসে”

“তাই হবে। সে রাতের পর আর কোনও দিন দেখা হয়নি। জানতামই না যে আমার একটা মেয়ে আছে। জীবনটা অন্যরকম হত, যদি একবার জানতে পারতাম। সময়টা পুরো ঘেঁটে গেছিল, যেদিন থেকে ফুচু আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। দাদা খুন, আমি গ্রেফতার, অরুণিমার পরিত্যাগ। ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ে। শুধু ওর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। জীবন কাটিয়ে দিলাম না জেনে, আমার একটা মেয়ে আছে”

“ফুচু কে?”

“আমাদেরই এক কমরেড। হাতে গোনা ক’জনের মধ্যে একজন। যে জানত লোধাশুলিতে আমাদের গুপ্ত আশ্রয়ের কথা। ও যদি আমাদের এভাবে ধরিয়ে না দিত, আমাদের একটা নর্মাল জীবন হত” কান্নায় ভেঙে পড়ল অগ্নিদেব। মল্ট শেষ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে।

নামটা কোথায় শুনেছে... !!

সৌরিক ওর পাশে এসে বসল “কিছুই হারায়নি। আপনার এক মেয়ে আছে। যাকে মা প্রতিপালন করেছেন”

এতখানি মল্ট খাওয়ার পর ক্রমশ অগ্নিদেবের হুঁশ হারিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে কাঁদছে। সৌরিক বুঝল, এখন ওকে কিছু বলে লাভ নেই। অশ্রুতেই ওর যন্ত্রণার নিবৃত্তি।

***

মাতৃশোকে বিষাদে অস্মিতা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে অক্ষমতার অতলে। ওর জীবনের এক অপরিহার্য অংশ হারিয়ে গেছে, যা জটায়ুর মতো ওকে সর্বক্ষণ আগলে রাখত। চিত্তরঞ্জন পার্কের ফ্ল্যাটে অন্ধকারে রবি ঠাকুরের গানেই সান্ত্বনাঃ

সব যে হয়ে গেল কালো
নিভে গেল দীপের আলো
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে?
অন্ধকারে রইনু পরে স্বপন মানি
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি!
সকাল বেলা চেয়ে দেখি,
দাঁড়িয়ে আছো তুমি এ কি
ঘরভরা মোর শূন্যতারই বুকের পরে

এটা ঠিক সৌরিক, দীপঙ্কর আঙ্কল আছে। কিন্তু তারা কী মায়ের শূন্যতা ভরাতে পারবে?

ঠিক সেই সময় সৌরিকের ফোন ‘‘ভুল সময়ে ফোন করলাম?’’

‘‘জানি না’’ অস্মিতা তখনও রবীন্দ্র আমেজে বিভোর।

‘‘তোমার জন্য ব্রেকিং নিউজ ম্যাডাম। তোমার অ্যাডপশন সার্টিফিকেটের খোঁজ করতে গিয়ে তোমার আসল বাবা-মায়ের নাম জানতে পেরেছি’’

‘‘কী…ই…ই…?’’

‘‘হ্যাঁ। তোমার মায়ের নাম অরুণিমা বিশ্বাস। খুব সম্ভবত ও এখন স্টেটসে থাকে। দারুণ গান করে। তোমার দীপঙ্কর আঙ্কলের সঙ্গে ওখানেই পরিচয়। তোমার বাবা আর কেউ না, স্বয়ং এসপি অগ্নিদেব চ্যাটার্জি’’

‘‘অ্যাডপশন কেন?’’

‘‘তোমার মা কুমারী ছিল, তাই’’

স্তম্ভিত অস্মিতা খাটের ওপর ছিটকে পড়ল। অবৈধ সন্তান! মিশ্র অনুভূতিতে ভেতরটা গুলিয়ে উঠল। ওর গ্লানিভরা আত্মা নিক্ষিপ্ত অজানা ঘূর্ণাবর্তে। অগ্নিদেবের কাছ থেকে যা কিছু জেনেছে, পুরোটাই একতরফা বলে গেল সৌরিক। নকশাল মুভমেন্ট, লোধাশুলি, জেলের দিনগুলো। অরুণিমার সঙ্গে ভালোবাসা। পরে জেলে থাকাকালীন অরুণিমার বিয়ে করে স্টেটসে যাওয়া। অস্মিতা শুনলেও অর্ধেক মাথায় বাইরে। কথা শেষে অপর প্রান্তে নিস্তব্ধ দীর্ঘশ্বাস।

‘‘অগ্নিদেব চ্যাটার্জি জানত না?’’

‘‘না, উনি তোমার অস্তিত্বের কথাই জানতেন না। আমার কাছেই প্রথম শুনলেন’’

আবার নিস্তব্ধতা। অস্মিতার মাথা ঘুরছে। নিজের মা তাকে ত্যাগ করেছে, ঐশিকা মায়ের স্নেহে বড় করেছে! অগ্নিদেব বাবা! ওকে কীভাবে নেবে জানে না।

ওকে সামলে নেওয়ার অবকাশ দিতে সৌরিক ফোনের লাইনটা কেটে দিল। নিজেও চুপ করে বসে। মনে করার চেষ্টা করল আর কী খবর জানা হল। তখনই আবার মনে পড়ল নামটা, ফুচু। অগ্নিদেব যাকে দোষী করছেন নিজের জীবনের বিপর্যয়ের জন্য। কোথায় শুনেছে? ও হ্যাঁ... দীপঙ্কর কাকুর কাছে। কাকুই বলেছিল ঐশিকা রায়ের ডাক নাম ফুচু! অগ্নিদেব কী করে জানল ওই নামটা? তার মানে অগ্নিদেব মাকে চিনত। কোথায় থাকে তা-ও জানত। মা এত বড় জনপ্রিয় অভিনেত্রী, না জানার কথা নয়। কোথায় থাকে সেটা বার করাও ওর পক্ষে কোনও ব্যাপার নয়। তা হলে কী অগ্নিদেব বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়েছে? এত বছর পর!

এই করোনা মহামারীর মধ্যে কোয়ারান্টিনে নজর এড়িয়ে ঢোকা-বেরোনো ওর পক্ষেই সবচেয়ে সহজ। অসম্ভব মোটেই নয়। যদিও প্রমাণ করা মুশকিল। একটা স্বীকারোক্তি প্রয়োজন।

"দেখা করতে চাই" অগ্নিদেবকে ফোন সৌরিকের।

"বারবার এত দূর ড্রাইভ করে আসাটা ঠিক নয়। তার চেয়ে আমি তোমার বাড়ি চলে যাব। রবিবার সকালে, কেমন হবে?"

"কোনও অসুবিধা নেই। চলে আসুন"

***

রবিবার সকালটা রোদে ঝলসাচ্ছে। অন্য গরমকালের দিনের মতোই। অগ্নিদেব একটা হালকা নীল হাওয়াইয়ান শার্ট, গাঢ় নীল ট্রাউজার চাপিয়ে যখন পৌঁছল, সৌরিক নেটে খবর পড়ছিল।

সৌরিক চা বানিয়ে নিয়ে এল। চায়ের কাপটা এগিয়ে সোজা প্রশ্ন "ফুচু, মানে মা, আপনার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছিল?"

চমকে উঠল অগ্নিদেব! চায়ে চুমুক দিয়ে বলল "হ্যাঁ। দাদার মৃত্যু, আমার জেলে যাওয়া, অরুণিমাকে হারানো, আমার সন্তানের অস্তিত্ব না জানার একমাত্র কারণ"

"কিন্তু সেই তো অস্মিতাকে মানুষ করেছে"

"সে তো ওর মাতৃসত্তাকে ভরাট করতে। অস্মিতাই কেন? বিয়ে করে তো আলাদা সংসার করতেও পারত"

"না, পারত না। ওর অল্প বয়েসেই হিস্ট্রেক্টমি হয়ে গেছিল। ইউটেরাসে ফাইব্রয়েড ছিল"

"তাতে কী যায় আসে। আমার জীবনটা তো শেষ করে দিয়েছে"

"তবে কী প্রতিশোধ নিতে ওকে খুন করেছেন?"

অগ্নিদেব কিছুক্ষণের জন্য চুপ। তারপর হাত এগিয়ে বলল "তোমার মোবাইলটা দাও তো"

অবাক সৌরিক ফোনটা এগিয়ে দিল। অগ্নিদেব ফোনটা সুইচ-অফ করে বলল "হ্যাঁ। আমিই খুন করেছি। বহু বছর ধরে অপেক্ষা করেছি এই সুযোগের জন্যে। শেষ পর্যন্ত এই লকডাউন সুযোগ করে

দিল''

''ওর ফ্ল্যাটে ঢুকলেন কী করে?''

''বেশ সহজেই। পিপিই স্যুট পরে। স্যানিটাইজেশন লোকেদের সঙ্গে মিশে, যাতে কেউ চিনতে না পারে। তারপর সুযোগ মতো স্যানিটাইজ করার অছিলায় অসুবিধাই হয়নি ফ্ল্যাটে ঢুকতে। খুন করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আবার দলের সঙ্গে মিশে যাওয়া''

''আগেই বোঝা উচিত ছিল, পুলিশ, মিলিটারি ছাড়া আর কার কাছে ৯ মিলিমিটার ১এ সেমি-অটোম্যাটিক পিস্তল থাকতে পারে''

''ও, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। যত বড় স্টারই হোক না কেন, ও প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, ছদ্মবেশে আরেক খুনি। আইনের চোখে ওর কোনও শাস্তি হবে না জানতাম। কিন্তু ওকে তো ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে'' অগ্নিদেব বলল শান্ত নিরবচ্ছিন্ন স্বরে।

''উনি অপনার মেয়েকে লালন করেছেন...'' সৌরিক বোঝাবার চেষ্টা করল।

''অস্মিতা আমার মেয়ে, সেটাই তো জানতাম না। তাতে কিছু আসে যায় না। অন্যের দুঃখের ওপর ভর করে স্বপ্নের প্রাসাদ তৈরি করা যায় না। যদি জানতামও, তা হলেও কোনও ব্যতিক্রম হত না''

অগ্নিদেব উঠে দাঁড়িয়ে সৌরিকের ফোনটা ফেরত দিল। নিশ্চিত হতে যাতে ওর স্বীকারোক্তি রেকর্ড না হয়।

সৌরিক হতভম্ব! অস্মিতার জন্যই খারাপ লাগছে। নিজের মা ত্যাগ করল। দত্তক মাকে নিজের বাবা খুন করল। ভাগ্যের কী পরিহাস! ও কি ওর বাবাকে ক্ষমা করতে পারবে?

একটু সময় লাগল দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে। সৌরিক গাড়ির চাবিটা তুলে নিল। ড্রাইভ করে লালবাজার পুলিস হেডকোয়ার্টারে...